অনন্ত লুঠের বাখান

রমেশচন্দ্র দত্তের হিসেবে ১৯০
বছরে যে ৬২০ মিলিয়ন পাউন্ড
লুঠ হয়েছে, তাতে যদি মাত্র
সরল ৫% সুদ প্রয়োগ করা
যায়, তার পরিমাণ হবে ২০১৬র
ভারতের জিডিপির ২/৩ ভাগ,
২০১৫র যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির
৪৫%; আর মন্টগোমারি মার্টিনের
নিদানে ১২% সুদে সে পরিমাণ
হয় ২০১৫র ব্রিটিশ জিডিপির
৬০০০ গুণ, ১২৯৩০.৫৪ ট্রিলিয়ন
পাউন্ড = ভারতীয় টাকায়
১০,৫৯,৫১,১০,০০,০০,০০০.০২
কোটি x ১২৯৩০.৫৪ টাকা

দেবোত্তম চক্রবর্তী ।। বিশ্বেন্দু নন্দ

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

অনন্ত লুঠের বাখান
Ononto Luther Bakhan
দেবোত্তম চক্রবর্তী, বিশ্বেন্দু নন্দ

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।।*
গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বহ্নিহোত্রী হাজরা, বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৬০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

রমেশচন্দ্র দত্তের ব্রিটিশ লুঠের অঙ্ক, সেটল্ড ফ্যাক্ট, - উৎসা পট্টনায়েক

উপনিবেশে আদায় করা বিপুল পরিমাণ রাজস্ব লুঠ করে মেট্রোপলিটনে সরানো বোঝাতে 'ট্রান্সফার' শব্দ ব্যবহার করেছেন উৎসা পট্টনায়েক। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় পলাশীর পরের সময়ের অনিয়ন্ত্রিত লুঠ বোঝাতে পণ্ডিতেরা সাধারণত 'ড্রেন', 'ট্রান্সফার', বাংলায় 'নির্গমন' ব্যবহার করে থাকেন। উপনিবেশের সম্পদ লুঠ ধারণার অন্যতম জনক স্বয়ং রমেশচন্দ্র দত্ত 'ড্রেন' শব্দ ব্যবহার করলেও, তাঁর সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে ১০০ বছর পর ফিরে দেখতে গিয়ে চাষী কারিগর, হকার এবং শ্রমিকদের তিল তিল দক্ষতা, জ্ঞান আর শ্রম ব্যবহার করে তৈরি করা বিপুল সামাজিক সম্পদ এবং জ্ঞানের লুঠকর্ম প্রক্রিয়াকে চিনির সিরা মাখিয়ে শুধুই নির্গমন হিসেবে তুলে ধরাতে কারিগর সংগঠনের আপত্তি আছে। প্রতিষ্ঠানিকেরা উপনিবেশ আলোচনায় সম্পদের হাত বদলকে 'ড্রেন' বা 'ট্রান্সফার' যাই বলুন, সেটা যে পশ্চিম ইওরোপিয় সাম্রাজ্যবাদীদের দিনে ডাকাতি - স্রেফ লুঠ, সেই তথ্য হকার কারগর চাষীদের পক্ষ থেকে সময় পেলেই কম্বুকণ্ঠে বার বার বলেছি, আগামী দিনেও বলব। একই সঙ্গে বলব ইওরোপ এবং আমেরিকায় গত আড়াইশ বছর ধরে বিপুল পরিমাণ পুঁজি সংহত হওয়ার প্রক্রিয়া সফল হয়েছে কলোনিগুলোয় দশকের পর দশক, কোথাও শতকের পর শতক জুড়ে নিরন্তর লুঠ চালানোর ফলেই। এই বিপুল সম্পদ সংহত হওয়ার পর বিশ্ব ভরকেন্দ্র, এশিয়া থেকে ইওরোপে সরে যাওয়া এবং গত ২০০ বছরের ইওরোপের আপাত চাকচিক্য, 'কোয়ালিটি অব লাইফ' নামক রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি নির্ভর ভদ্রবিত্তদের পারিবারিক-সামাজিক স্বচ্ছলতা, অর্থনীতির ইতিহাসে বর্ণিত 'ইওরোপিয় মিরাকল' বা 'ইওরোপের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিশীলতা' বা এই রকম লুঠ নিরপেক্ষ তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্মিত হয়নি, বরং রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত উপনিবেশ-শাসক-ধন্য নবজাগরণী কোলাবরেটর ভদ্রবিত্তদের ব্যবহার করে গণহত্যা পরিবেশ তৈরি করে সম্পদ লুঠ করতে সাহায্য করা, এবং ইওরোপে পৌঁছোনো সেই সম্পদকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করে বিনিয়োগযোগ্য করে তোলার ফলেই ইওরোপের স্বচ্ছলতা এবং লুঠেরা দখলদারি গণহত্যাকারী পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে পেরেছে, সেই কার্য-কারণ সম্পর্কও খোলসা করে বলা দরকার। রাজস্ব-নির্ভর-সমর-রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করে লুঠজাত পুঁজির বিনিয়োগকে নানাধরণের সামাজিক রাষ্ট্র বিপ্লবে নিরাপত্তা দেওয়া এবং পুঁজি বিপদে পড়ে ক্ষইতে থাকলে কর্পোরেটকে জনগণের পকেট কেটে বিশুদ্ধ বেলআউট ভর্তুকি দেওয়া নিশ্চিত করার পরিবেশ তৈরি করার উদ্যম, যাকে আমরা আজ লিবারেল অর্থনীতিতে উন্নয়ন বলে আখ্যায়িত করি, তাকেও তুলে ধরছি সাংগঠনিক কাজকর্মে।

এই প্রবন্ধ গড়ে তুলতে ব্যবহার করা উৎসার দুটো প্রবন্ধই দিক নির্দেশী। তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের গবেষণাকে একশ বছর পর একবিংশ শতকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তাঁর দুটো প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ ব্যবহার করে একটা প্রবন্ধ গড়েছি। প্রবন্ধের প্রথম অংশটা নিয়েছি 'রিভিজিটিং ড্রেন অর ট্রান্সফার ফ্রম ইন্ডিয়া টু ব্রিটেন ইন দ্য কন্টেক্সট অব গ্লোবাল ডিফিউশন অফ ক্যাপিট্যাল' থেকে। আর

প্রবন্ধের 'উত্তর (গোলার্ধ) ও দক্ষিণ (গোলার্ধের) উৎপাদন ক্ষমতার অসামঞ্জস্য' অংশ থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়েছি উৎসা আর প্রভাত পট্টনায়েকের মান্থলি রিভিউ প্রেস বুক প্রকাশিত 'ক্যাপিট্যাল এন্ড ইম্পিরিয়ালিজম - থিওরি, হিস্ট্রি এন্ড দ্য প্রেজেন্ট'এর ৯ নম্বর অধ্যায়ের 'এসিমেট্রি অব প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিজ বিটুইন দ্য নর্থ এন্ড দ্য সাউথ'এর ৯টা অনুচ্ছেদ। এই দুই পর্ব জুড়েছি কবি-অর্থনীতির অধ্যাপক তরুণ সান্যালের সম্পাদনায় স্বয়ং রমেশচন্দ্র দত্তের 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ১৭৫৭-১৮৩৭' একাংশ ব্যবহার করে, যেখানে তিনি কোম্পানি শাসনের প্রথম যুগে ১৭৬৫ থেকে ১৭৭১ - লুঠ কার্যক্রম বিষয়ে লিখেছেন, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর লুঠ তত্ত্ব। একই সঙ্গে ভুলে যাওয়া আরও একজন অগ্রপথিক, ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনের 'এন একাউন্ট অব দ্য ডিসট্রিক্ট অব বিহার এন্ড পাটনা'র সম্পাদক রবার্ট মন্টগোমারি মার্টিনের 'দ্য হিস্ট্রি, এন্টিকুইটিজ, টোপোগ্রাফি এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকার শেষটুকু, লুঠ অংশ ব্যবহার করেছি। আমার জানা মতে তিনি কোম্পানির বঙ্গ লুঠের তত্ত্বকে সর্বপ্রথম মূর্ত করেছেন। আমার ধারণা রমেশচন্দ্র তাঁর লুঠ তত্ত্বের ভিত্তি তৈরি করেছেন মন্টগোমারি মার্টিনের বিশ্লেষণ থেকে।

ইওরোপিয় সাম্রাজ্যগুলো অ-ইওরোপিয় উপনিবেশ থেকে শতকের পর শতক বিপুল পরিমাণে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত লুঠ করে মেট্রোপলিটনে চালান করার তত্ত্ব আলোচনা করেছেন সাম্রাজ্যের লুঠ বিষয়ক তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ মার্ক্সবাদী উৎসা পট্টনায়ক। সাধারণত উপনিবেশিক ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণে মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিকদের বড় অংশ ইওরোপিয় সাম্রাজ্যের কৃতিতে আস্থা প্রকাশ করেন। অধিকাংশই নবজাগরণ এবং আধুনিক দক্ষিণ এশিয়া, তার সাম্রাজ্য সহযোগী ভদ্রবিত্ত সমাজ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়ে ওঠা, উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে মুখ্যত ইওরোপিয় সাম্রাজ্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এদের অনেকেরই লেখাতে উপনিবেশিক লুঠের উল্লেখ ছিল না। উপনিবেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস বর্ণনায় একই ধারাবাহিকতা আমরা দেখি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গী কেম্ব্রিজ ইতিহাস আঙ্গিকেও। তপন রায়চৌধুরী, ইরফান হাবিব, ধর্মা কুমার, মেঘনাদ দেশাইদের সম্পাদিত 'দ্য কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া'র কোনও খণ্ডেই লুঠ তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। অথচ বিংশ শতকের গোড়ায় প্রাক্তন ব্রিটিশ আমলা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি আস্থাবান জমিদার পরিবারের সদস্য রমেশচন্দ্র দত্ত স্পষ্টভাবে উপনিবেশিক লুঠের পদ্ধতি বাতলেছেন এবং পরিমাণ কষেছেন। এই গত সহস্রাব্দের নয়ের দশক থেকে উপনিবেশের লুঠ ইত্যাদি নিয়ে অমিয় কুমার বাগচী, উৎসা পট্টনায়েক, মৃদুলা মুখার্জী, প্রভাত পট্টনায়েক এবং আরও কিছু গবেষক দক্ষিণ এশিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লুঠতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন। উৎসা পট্টনায়েক লুঠ তত্ত্বের দুই জনক রমেশচন্দ্র দত্ত আর দাদাভাই নৌরজীর তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়ে বলছেন, ১০০ বছর আগে রমেশচন্দ্র যে লুঠের অঙ্ক উল্লেখ করেছেন, সেটি 'সেটলড ফ্যাক্ট', তাঁর লুঠের অঙ্ক কষার পদ্ধতি প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। আমরা এই প্রবন্ধে বুঝতে চেষ্টা করব, উৎসা কোন যুক্তিতে ১০০ বছর আগের লুঠ তাত্ত্বিক রমেশচন্দ্রের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লুঠ বোঝার পদ্ধতিকে সমর্থন করছেন আর তাঁর কষা অঙ্কের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এখানে একটা কথা না বললে সত্যের

অপলাপ হবে, রমেশচন্দ্রের ৬ দশক আগেই ১৮৩৮-এই মন্টগোমারি মার্টিন স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ লুঠের কথা বলেছেন। তাঁর সেই বক্তব্যের অনুবাদ এই পুথির অন্য একটি প্রবন্ধে সামিল করা গেল।

উৎসার লুঠ বাখ্যানে প্রবেশের আগে লুঠ বিষয়টা মূর্ত করতে ৬০ বছর ব্যবধানের দুই অগ্রজ গবেষক রবার্ট মন্টগোমারি মার্টিন আর রমেশচন্দ্র দত্তের দুটো লেখা থেকে উদ্ধৃতি আর সংখ্যাতত্ত্ব অনুবাদ করব। মাথায় রাখতে হবে হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লুঠের প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজীর আগেও মন্টোগোমারি মার্টিন, সেটা উৎসা প্রাথমিকভাবে উল্লেখ করেননি তাঁর প্রবন্ধে, তিনি রমেশ দত্তের লেখা থেকেই মার্টিনের সংখ্যাতত্ত্ব উল্লেখ করেছেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্তর 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ১৭৫৭-১৮৩৭'-এর প্রথম খণ্ড (যেখানে তিনি প্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লুঠ ধারণা ব্যবহার করলেন) ১৯০২ সালে প্রকাশ হওয়ার আগে, ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত কোম্পানির শল্য চিকিৎসক, ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনের বিহারে চালানো সমীক্ষার 'এন একাউন্ট অব দ্য ডিসাট্রিক্ট অব বিহার এন্ড পাটনা'য়। তার টিকা করেন ১৮৩৮-এ মন্টগোমারি মার্টিন সম্পাদক রবার্ট মন্টগোমারি মার্টিনের 'দ্য হিস্ট্রি, এন্টিকুইটিজ, টোপোগ্রাফি এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'বইতে। মুখবন্ধে মার্টিন লিখছেন কীভাবে ব্রিটিশ এই দেশের প্রতিটি পাইপয়সা লুঠ করেছে। তার বক্তব্যে বিশিল্পায়নের ইঙ্গিত স্পষ্ট, 'ইংল্যান্ড হিন্দুদের বাধ্য করেছে ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার, গ্লাসগো, ইত্যাদি বাষ্পীয় কলের তাঁতের পণ্য নিছক নামমাত্র শুল্কে গ্রহণ করতে; অথচ বাংলা ও বেহারের হাতে তৈরি সুন্দর ফ্যাব্রিক এবং পরিধানে টেকসই বস্ত্র ইংলন্ডে আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে; প্রাচ্যের কারিগরদের ধ্বংস করেছে আমাদের বার্মিংহাম, স্টাফোর্ডশায়ারের গার্হস্থ্য পণ্য। ইংলন্ড এদেশের বাজারে পণ্য বিক্রি করে ধনসঞ্চয় করেছে… England has compelled the Hindoos to receive the products of the steam looms of Lancashire, Yorkshire, Glasgow, &c., at mere nominal duties; while the hand-wrought manufactures of Bengal and Behar, beautiful in fabric and durable in wear, have had heavy and almost prohibitory duties imposed on their importation into England; our Birmingham, Staffordshire and domestic wares have ruined the native artisans of the East, who endeavoured to compete with the accumulation of wealth and steam-power in England; while by a suicidal folly, we have refused to receive the sugars, coffee, rum, tobacco, &c. the cultivation of which might have enabled the unfortunate Hindoos to cease being the periodical victims of famine and pestilence. In public works we have done nothing for India; everything has been subservient to the imperious necessity of raising £20,000,000 yearly, to meet the expenses of an army of 200,000 men, and a large costly civil establishment. For half a century we have gone on draining from two to three and sometimes four million pounds sterling a year from India, which has been recitable to Great Britain, to meet the deficiencies of commercial speculations; to pay the interest of debts, to support

the Home establishment, and to invest on England's soil the accumulated wealth of those whose life has been spent in Hindoostan.

লুঠের পর্ব আলোচনায় খোলাখুলি সাম্রাজ্য বিরোধিতা করছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ১৭৫৭-১৮৩৭, প্রথম পর্বে (সম্পাদনা তরুণ সান্যাল) তিনি লিখছেন -

'১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের হাউস্ অব কমন্সের চতুর্থ রিপোর্টে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানী মঞ্জুরীর পর বঙ্গদেশে প্রথম ছয় বৎসরের রাজস্ব ও আর্থিক ব্যয়ের একটি হিসেব আছে। তার থেকে নিম্নলিখিত সারণীর পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়েছে -

বছর (মে-এপ্রিল)	*মোট আদায় (পাউন্ড)*	*মুঘল বাদশাহের রাজস্ব, নবাবের ভাতা, আদায়ের খরচ, বেতন, কমিশন প্রভৃতি বাদ দিয়ে নীট রাজস্ব (পাউন্ড)*	*সামরিক, বেসামরিক গৃহ নির্মাণ, দুর্গ প্রভৃতি খাতে মোট ব্যয় (পাউন্ড)*	*বাৎসরিক নীট উদ্বৃত্ত (পাউন্ড)*
১৭৬৫-১৭৬৬	২২৫৮২২৭	১৬৮১৪২৭	১২১০৩৬০	৪৭১০৬৭
১৭৬৬-১৭৬৭	৩৮০৫৮১৭	২৫২৭৫৯৪	১২৭৪০৯৩	১২৫৩৫১০
১৭৬৭-১৭৬৮	৩৬০৮০০৯	২৩৫৯০০৫	১৪৮৭৩৮৩	৮৭১৬৬২
১৭৬৮-০১৭৬৯	৩৭৮৭২০৭	২৪০২১৯১	১৫৭৩১২৯	৮২৯০৬২
১৭৬৯-১৭৭০	৩৩৪১৯৭৬	২০৮৯৩৬৮	১৭৫২৫৫৬	৩৩৬৮১২
১৭৭০-১৭৭১	৩৩৩২৩৪৩	২০০৭১৭৬	১৭৩২০৮৮	২৭৫০৮৮

'এই পরিসংখ্যানই দেখিয়ে দিচ্ছে যে বঙ্গদেশের নীট রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই প্রতিবৎসর দেশের বাইরে পাঠানো হত। কিন্তু এই দেশ থেকে আধিক নিকাশের প্রকৃত পরিমাণ ছিল আরও বেশী। বেসামরিক ও সামরিক খরচের একট বিরাট অংশ ছিল পদস্থ ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের বেতন। সমস্ত সঞ্চয়ই তারা [উপনিবেশ, ভারতবর্ষের] বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। বৈধ বাণিজ্য ও শিল্প থেকে দেশী বণিকদের হটিয়ে দিয়ে গড়ে তোলা বিরাট ঐশ্বর্যও প্রতিবৎসর বাইরে চলে যেত। গভর্ণর হ্যারি ভেরেল্ষ্ট কর্তৃক সংগৃহীত ১৭৬৬, ১৭৬৭ ও ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ক পরিসংখ্যানে প্রকৃত আর্থিক নিকাশটি বোধ হয় আরও শুদ্ধরূপে পরিবেশিত:

আমদানি	*রপ্তানি*
পাউন্ড ৬২৪,৩৭৫	পাউন্ড ৬,৩১১,২৫০

'অন্যভাবে বলা যায়, দেশে যা আমদানি হত, দেশ থেকে তার দশগুণ রপ্তানি হ'ত। শ্রীযুত ভেরেল্ষ্ট এই কুফলের বিস্তার নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এরই ফলে উদ্ভুত দেশের জনসাধারণের শোচনীয় আধিক অবস্থা তিনি অক্লান্ত ভাবে বর্ণনা করে গেছেন।

'পূর্বে [মুঘল আমলে] দিল্লীতে যে পরিমাণ অর্থই প্রেরিত হয়ে থাক না কেন, বিপুল বাণিজ্যের প্রতিদানে তা বঙ্গদেশে যথাযথভাবে পুনঃসংগৃহীত হত - নবাবের এলাকার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে এ-গুলির কি বিরাট পার্থক্য!... এই প্রদেশের সম্পদবৃদ্ধিকল্পে একটি টাকা জমা না দিয়ে প্রত্যেকটি ইয়োরোপীয় কোম্পানিই এ দেশে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা তাদের বাৎসরিক লগ্নীর পরিমাণ বহুল পরিমাণে বর্ধিত করেছে।

'সব দিক থেকে অর্থ সরবরাহের জন্য এই প্রদেশের উপর যে বিপুল চাপ সৃষ্ট করা হয়েছে তা আপনাদের কোষাগারকে শোচনীয় অবস্থায় পরিণত করেছে এবং এই দেশ থেকে এত বিপুল রপ্তানির অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের কথা ভেবেই আমরা শঙ্কিত হচ্ছি।

'একথা বললে খুব বাড়িয়ে বলা হবে না যে যত সমৃদ্ধই হোক না কেন, যদি কোন দেশ কোনরূপ আর্থিক সাহায্য না পায় এবং সামগ্রিক বাৎসরিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বাৎসরিক ঘাটতি বহন করে, তার উন্নতিলাভ তো দূরের কথা সে দেশের পক্ষে বেশী দিন টিকে থাকাই অসম্ভব। কিন্তু এ ছাড়াও আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি আছে যা দেশের সম্পদহ্রাস করেছে এবং, যদি এর প্রতিবিধান না হয়, তবে তা অবিলম্বেই সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলবে। পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, পূর্বে এই দেশ যে বিরাট সুবিধা ভোগ করত, তা হল বিভিন্ন পরিবারকে অনুদান এবং শাসকবর্গের ব্যয়বহুল বিলাসিতার মাধমে রাজস্বের বন্টন। কিন্তু এখন ভূমি থেকে আহৃত সমস্ত অর্থ একটি গহ্বরই গ্রাস করছে-তা হল আপনাদের কোষাগার। আমাদের লগ্নী ও প্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে উৎসারিত অর্থ ব্যতীত, এর বিন্দুমাত্র অংশও বাজারে সঞ্চালিত হয় না।

'এই লগ্নী বলতে কি বোঝাত হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের নবম রিপোর্টে তা পরিষ্কার করে বলেছেন।

'বঙ্গদেশের রাজস্বের একটা নির্ধারিত অংশ বহু বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডে রপ্তানির উদ্দেশ্যে মাল কিনবার জন্য আলাদা করে রেখে দেওয়া হয় এবং একেই বলে লগ্নী। এই লগ্নীর বিশালত্বের অনুপাতেই কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারীদের গুণাবলীর মান সাধারণতঃ নিরূপণ করা হয়। ভারতের দারিদ্র্যের এই মূল কারণকেই সে দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধির পরিমাপ হিসেবে সাধারণতঃ ধরা হয়ে থাকে। প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে বিরাট বিরাট জাহাজের বহর প্রতি বৎসর অবিরাম ও ক্রমবর্দ্ধিত সাফল্যের সঙ্গে ইংলন্ডে পৌঁছে লোকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিত এবং যে দেশের উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাণিজ্য দুনিয়ার এত বড় একটা সীমানা অধিকার করে রাখতে পারে, স্বাভাবিকভাবেই সে দেশের সচ্ছল পরিস্থিতি ও ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির ধারণা এরই ফলে সৃষ্ট হত। ভারতবর্ষ থেকে এই রপ্তানি অন্য দিকে একটা অনুপূরক যোগানের ব্যবস্থারও ইঙ্গিত দিত যার ফলে ঐ যোগানদ্রব্যের উৎপাদনে বিনিযুক্ত বাণিজ্যিক মূলধন ক্রমাগতই জোরদার হচ্ছিল ও বেড়েই চলছিল। কিন্তু লাভজনক ব্যবসার পরিবর্তে বরং ঐ দেশের কাছে প্রদত্ত রাজস্ব আপাতরম্য অথচ বিভ্রান্তিকর রূপ ধারণ করেছিল।

'গভর্ণর ভেরেলষ্ট ও হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত অবিরাম আর্থিক নিকাশের কুফলের দিক ইংলণ্ডের মহত্তম রাষ্ট্র দার্শনিকও নিন্দা

করেছেন। যে ভাষায় তিনি সেই নিন্দা করেছেন, যতদিন ইংরেজী ভাষা লোকে বুঝবে, ততদিন তা সকলে পড়বে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ফকস্-এর ইণ্ডিয়া বিলের ওপর বক্তৃতায় এডমণ্ড বার্ক ভারতের থেকে স্থায়ী আর্থিক নিকাশের ফলে রসশূন্য করে দেওয়ার ফলাফলের কথা বর্ণনা করেছিলেন। তার মত বড় বাগ্মীও তাঁর আইনসভার সমস্তকালীন গৌরবোজ্জল জীবনে এর চেয়ে জোরালো, ওজস্বী ও সত্যনিষ্ঠ ভাষণ কাদাচ দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ।'

আগেই বলেছি উৎসা পট্টনায়েক স্পষ্টতঃই রমেশচন্দ্র দত্তের উপনিবেশিক লুঠ তত্ত্বটিকে মান্যতা দিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের গবেষণার ১০০ বছর পর পূর্বজর কাজকে বৈধতা দিতে গিয়ে উৎসা লিখছেন, অষ্টাদশ শতকের মধ্যপর্বে মুঘল বাংলা সুবা থেকে উপনিবেশের লুঠজাত সম্পদ ইওরোপে পৌঁছনোর পরে সেখানে দ্রুত দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, প্রথমত ব্রিটেনে শিল্পকাঠামোয় বিপুল পরিবর্তন এসে একের পর এক কেন্দ্রিভূত শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার কাঠামো তৈরি হল, এবং একই সঙ্গে ইওরোপিয় বসতিগুলোও একই প্রক্রিয়ায় শিল্পায়িত হয়ে অন্য চেহারা ধারণ করল; পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলো, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার মত সেটলার কলোনিগুলোয় পুঁজিবাদ ছড়িয়ে পড়ে প্রায় মুহূর্তের মধ্যে। তিনি দুঃখ করে বলছেন, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে মেট্রোপলিটনের অধিকাংশ লেখায়, উপনিবেশিক দেশগুলো থেকে যত পরিমাণ সম্পদ মেট্রোপলিটন লুঠ করেছে কোলাবরেটর মারফত, সেই বিপুল পরিমাণ সম্পদের কথা উল্লেখ তো দূরস্থান, এই লুঠকর্মও খুব কম সেই সব গবেষণায় আলোচিত হয়েছে - এর একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল জনপ্রিয় প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চার আঙ্গিক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসচর্চা। অথচ উৎসা বলছেন, এই আলোচনা উপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষ নামক কলোনিতেই হয়েছে। পশ্চিম ইওরোপের পুঁজি সংহত হওয়া দেশগুলোর নেতা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সব থেকে বড় উপনিবেশ, ভারতবর্ষ থেকে 'সম্পদের লুঠ, drain of wealth' নিয়ে একশ বছরের বেশি সময় আগে কলমপাত করেছেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান জমিদারপুত্র রমেশচন্দ্র দত্ত এবং দাদাভাই নৌরজী। উৎসা বলছেন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক জুড়ে ইওরোপিয় মেট্রোপলিটনগুলোয় উপনিবেশগুলো থেকে 'সম্পদের লুঠ, drain of wealth' তত্ত্ব নিয়ে খুবই কম আলোচনায় এসেছে। ইওরোপ জুড়ে শিল্প গড়ে ওঠার যুক্তি দেখানো হয়েছে 'দেশগুলোর মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা' অথবা 'ইওরোপিয় মিরাক্যাল তত্ত্ব'। এবং এই প্রসঙ্গ ধরে বহু গবেষক মন্তব্য করেছেন, মেট্রোপলিসের কাছে উপনিবেশ পরিচালনা স্রেফ বোঝা, সেগুলোর দায় ঝেড়ে ফেললে হয়ত ইওরোপিয় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া আরও ভাল ফল করত। বার্নারড সেমেল 'দ্য রাইজ অব ফ্রি ট্রেড ইম্পিরিয়ালিজম' বইতে বলছেন রক্ষণশীল মুখ্যমন্ত্রী ডিসরেলি ১৮৫২ সালে উপনিবেশ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'these wretched colonies…a millstone round our necks' (হতভাগ্য উপনিবেশ... আমাদের গলায় পাথর হয়ে ঝুলে আছে)।

তিনি বলছেন লুঠ তত্ত্বের প্রথম যুগের প্রবক্তা-তাত্ত্বিকেরা, লুঠ তত্ত্ব উপস্থাপনায় তাত্ত্বিকভাবে অনুসরণযোগ্য পথ তৈরি করেছিলেন বলেই আজকের দিনের মুক্ত অর্থনীতির ম্যাক্রোইকনমিক্স তত্ত্বে লুঠ তত্ত্ব তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে দেখানো যায় অতি সহজেই। বিশ্ব বাণিজ্য তথ্য থেকে প্রমাণ করা যায় মেট্রোপলিটন, উপনিবেশগুলো থেকে বিশাল

অঙ্কের (‘ভেরি লার্জ’) সম্পদ ড্রেন/লুঠ করেছে। উৎসা মেট্রোপলিটনের দিকে আঙুল তুলে বলছেন, ইওরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং সাম্প্রতিককালের ইওরোপিয় বাসভূমিগুলোয় পুঁজিতন্ত্র বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের বিপুল অঙ্কের পুঁজি বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার সফলতার কারণ হল উপনিবেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ আমদানি-রপ্তানিজাত লুঠ উদ্বৃত্ত পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে পারা এবং উপনিবেশকে পশ্চাদভূমি হিসেবে ব্যবহার করে, উপনিবেশিক কাঁচামালকে ইওরোপিয় কেন্দ্রিভূত শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জুড়ে উৎপন্ন পণ্য বিশিল্পায়িত উপনিবেশের বাজারে বিনা বাধায়, প্রায় বিনা শুল্কে প্রবেশাধিকার পাওয়ার নীতি।

কীভাবে উপনিবেশিক সম্পদ লুঠের ধারণাকে তত্ত্বায়িত করা হয়েছিল

উৎসা ‘রিভিজিটিং ড্রেন অর ট্রান্সফার ফ্রম ইন্ডিয়া টু ব্রিটেন ইন দ্য কন্টেক্সট অব গ্লোবাল ডিফিউশন অফ ক্যাপিট্যাল’ প্রবন্ধে বলছেন, সম্পদ লুঠের প্রথম দুই তাত্ত্বিক দাদাভাই নৌরজী আর রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতবর্ষের সম্পদ লুঠের ধারণাটিকে খুব সহজ তত্ত্বে ধরেছেন। তিনি বলছেন, দেশের গড় জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ যদি জানা থাকে, তাকে যেমন উৎপাদনের দৃষ্টিতেও বিশ্লেষণ করতে পারি, আবার অন্য দিকে আয়ের দিক থেকেও বিশ্লেষণ করতে পারি। একইভাবে উপনিবেশ থেকে সম্পদ লুঠের পরিমাণকে আমরা দু’ভাবে পরিমাপ করতে পারি, উপনিবেশের বাজেট সূত্রে এবং বৈদেশিক একাউন্টের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লুঠের একই অঙ্কতে উপনীত হব।

মাথায় রাখতে হবে লুঠ তত্ত্বের অগ্রপথিক রমেশচন্দ্র দত্ত বা দাদাভাই নৌরজী একশ বছর আগে যেভাবে লুঠের পদ্ধতি বিকাশ আর লুঠ হওয়া অঙ্কের পরিমাণ হিসেব করেছেন, আজও তাত্ত্বিক, প্রায়োগিকভাবে সেই তাত্ত্বিক অবস্থান চ্যালেঞ্জ জানানো বা অতিক্রম করার অবস্থায় নেই। অধিকাংশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের কর্মী কিন্তু সে পথ অনুসরণ করেননি। উৎসা বলছেন একশ বছর আগে এই দুই তাত্ত্বিকের গবেষণা উপনিবেশিক অর্থনীতিতে লুঠ প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে আমাদের গভীর গুণগত অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করে ‘উপনিবেশে যে পরিমাণ কর আদায় হয়, তার খুবই বড় অংশ, প্রায় একের তিন ভাগ, উপনিবেশে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় খরচ করা হয় না, সে টাকা সরিয়ে রাখা হয় শুধুই বিদেশে ব্রিটেনের স্টার্লিং খরচের জন্যে। প্রশ্ন হল ভারতীয় বাজেটের টাকার একাংশ কীভাবে ব্রিটিশ স্টার্লিং-এ রূপান্তরিত হয়? উপনিবেশে উৎপাদকদের থেকে আদায় করা করের টাকা দিয়েই তাদের পণ্য কিনে বিদেশে রপ্তানি করা হয়, এবং সেই অর্থে যে সোনা আর বিদেশিমুদ্রা আয় হয় সেটি মেট্রোপলিসে জমা রাখা হয় শুধুই মেট্রোপলিটনের স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে (a substantial part (up to one-third) of the total tax and other revenues raised within the colony was not spent in the normal way within the country, but set aside for sterling expenditure by Britain on its own account abroad. But how did the transformation of rupees in the Indian budget into sterling with Britain take place? By using that part of revenues to reimburse colonized producers of export goods (the very same producers who had paid in the taxes in the -first place!), while the financial gold and foreign exchange (forex) earned through their global net commodity exports was appropriat-

ed by the metropolis for its own use)। অর্থাৎ উপনিবেশিক বাজেটের বিপুল অংশ সরিয়ে রাখা হত লুঠের পরিকল্পনা করে বলেই, উৎসাহ থাকলে সাম্রাজ্যবাদী লুঠের এই অঙ্কের পরিমাপ আজও করা যায়। বিপরীতে উপনিবেশের বাড়তে থাকা কাঁচামাল রপ্তানির বিপুল উদ্বৃত্ত উপনিবেশে না পাঠিয়ে পুরোটাই মেট্রোপলিটনে জমা হয়েছে। ইওরোপ, আমেরিকায় পুঁজি সংহত হওয়ার তরিকাই ছিল স্রেফ দিনে ডাকাতি।

উৎসা বলছেন, দাদাভাই নওরোজি আর রমেশচন্দ্র দত্ত লুঠের একটা বিষয় আলোচনায় আনেননি, কারণ সেই ঘটনা তাদের গবেষণা প্রকাশ হওয়ার পরের যুগের। ১৮৯০-এর পরের চার দশক ভারতবর্ষের কারিগর শ্রমিক কৃষকের তৈরি পণ্য বিশ্ব ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্কের পণ্য রপ্তানি ছিল। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে কারেন্ট একাউন্ট উদ্বৃত্ত দেখানো তো দূরস্থান, তাকে কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্স দেখাবার অধিকার দেওয়া হত না। তৎকালীন আমলের বিশ্বের পুঁজিপতিদের নেতা ব্রিটেনের বাড়তে থাকা কারেন্ট একাউন্ট ঘাটতি সত্ত্বেও এই যে বিপুল রোজগার তার একাউন্টে জমা হত, সে এই সম্পদকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করে, সেই পুঁজি ইওরোপের দেশগুলো এবং ইওরোপিয়দের বসতিওয়ালা দেশগুলোয় রপ্তানি করেছে। আজকে উন্নত দেশ বুঝতে সে সব দেশ বুঝি, সেই সব অঞ্চলে সেই সময়ে মেট্রোপলিটনে জমা হওয়া উপনিবেশিক উদ্বৃত্ত পুঁজি হিসেবে নিয়োজিত হয়েছে।

উৎসা লুঠ কাণ্ডের শুরুর সময় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার পেয়েছে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। প্রথম যুগের মার্কেন্টিলিস্টদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে তাদের দেশের কোনও উৎপন্ন দ্রব্যই বিক্রি করতে পারত না, তাই তাদের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির মুখোমুখি হতে হয়েছে দশকের পর দশক। তাদের রূপোর বিনিময়ে ভারতবর্ষীয় পণ্য কিনতে বাধ্য হতে হয়েছে। ১৭৬৫-এর পর ইতিহাস পাল্টে গেল মুঘল সাম্রাজ্য তাকে বাংলা বিহার ওডিসার দেওয়ানি, অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্পণ করায়। এটা ছিল তৎকালীন যুগে বিশ্বের সব থেকে বড় রাজস্ব আদায়ের আউটসোর্সিং প্রকল্প। সেই বছর থেকেই সে বাংলার চাষী কারিগরদের থেকে আদায় করা রাজস্বে বাংলার পণ্য কিনে ইওরোপে রপ্তানি করতে শুরু করে। সে সময়ে বাংলার জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি, ইংলন্ডের চারগুণ। কোম্পানি বিপুল সম্পদ লালসায় কয়েক বছরের মধ্যেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ তিনগুণ করতে গিয়ে সে বাংলায় ১৭৭০-এর মন্বন্তর (আমরা যাকে গণহত্যা নামে চিহ্নিত করি) ঘটাতে বাধ্য হয়েছে। ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে ইংলন্ডের থেকে বেশি রাজস্ব আদায়ের ভূখণ্ড হল বাংলা। পরের ৮০ বছর সে রাজস্ব আদায় ক্রমাগত বাড়াতে থাকবে, বাংলার রাজস্ব নির্ভর করে সে দক্ষিণ এশিয়ার রাজ্যগুলো বম্বে, দক্ষিণ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, অবধ দখলে আনবে। ১৮৮৫-এ বর্মা পুরোপুরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় আসার আগে তিন তিনটে যুদ্ধ হয়েছে - বাংলার রাজস্ব ভিত্তি করে। আরও বেশি রাজস্ব আদায় করতে জেলায় জেলায় কালেক্টর নিয়োগ করে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হল। আদায় করা রাজস্ব দিয়ে সে নিজের মেট্রোপলিটনের চাহিদা পূরণ করেও দেশে দেশে রপ্তানি করেছে বাংলার কৃষক-কারিগরের কাপড়, চাল, সোরা, নীল, আফিম, তুলো, পাট। বিনয় ভূষণ চৌধুরী 'গ্রোথ অব কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার

ইন বেঙ্গল ১৭৫৭-১৯০০' বইতে দেখিয়েছেন কৃষকদের ওপর প্রভূত অত্যাচার চালিয়ে নীল আর আফিম চাষ কাঠামো কর্পোরেট রাষ্ট্র একচেটিয়া দখল নেয়। তিনি দেখিয়েছেন রপ্তানিযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল চাষের বাড়বাড়ন্ত ঘটেছে রাজস্ব-লাভ বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে।

কোন জাদুতে গ্রীষ্মমণ্ডলের ফসল তুলনামূলক শস্তায় পেত ব্রিটেনের ভোক্তারা সেই পথ আমাদের সামনে খুলে দিয়েছেন উৎসা তাঁর প্রবন্ধে। ধরা যাক উপনিবেশিক ভারতবর্ষের চাষী-কারিগর রাষ্ট্রকে ১০০ টাকা রাজস্ব দিত। ১০ গজ কাপড় আর ২ বস্তা চাল স্থানীয় পাইকারকে ৫০ টাকায় বিক্রি করত। স্বাভাবিক বাজার নির্ভর ব্যবসায় চাষী-কারিগর নিজেই অর্থ বিনিয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করে এবং স্থানীয় বাজারে সেই পণ্য বিক্রি করত লাভের আশায়। ধরে নেওয়া যাক, স্থানীয় পাইকার চাষী-কারিগর উৎপাদকের ১০ গজ কাপড় আর ২ বস্তা চাল না কিনে, এই দ্রব্য ৫০ টাকা দিয়ে বাজার থেকে কিনছে কোম্পানি নিযুক্ত পাইকার বিদেশে রপ্তানির জন্যে। মাথায় রাখতে হবে চাষী-কারিগর কিন্তু তার উৎপাদনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকে ১০০ টাকা রাজস্ব দিয়েছিল। তারই দেওয়া ৫০ টাকা রাজস্ব আবার চাষীকে ফেরত দিল রাষ্ট্রের হয়ে রাষ্ট্র নিযুক্ত পাইকার। অর্থাৎ উৎসা বলছেন, কোম্পানিকে যেমন পণ্য কেনার জন্যে নিজের পকেট থেকে একটা টাকাও খরচ করতে হল না, তেমনি কোম্পানির পাইকারকে চাষী-কারিগর পণ্য বিক্রি করে যে অর্থটা পেলেন, সেটা উপনিবেশিক রাষ্ট্রকে দেওয়া তার নিজেরই রাজস্বের অংশ, অর্থাৎ চাষী-কারিগর নিজের তৈরি পণ্য বিক্রি করে একটা টাকাও উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারলেন না। কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী আর কোম্পানির পণ্য সংগ্রাহক যদি একই লোক হত তাহলে হয়ত চাষী-কারিগরের পক্ষে এই লুঠ চক্কর বুঝতে সমস্যা হত না। কিন্তু সমস্যা হল এই দুজন মানুষ আলাদা আলাদা - রাজস্ব কালেক্টর আর কোম্পানির পাইকারদের মধ্যে যে আদৌ কোনও সংযোগ আছে, তার দেওয়া রাজস্ব যে তার কাছেই ফেরত আসছে, সেই ধারণাটা চাষী-কারিগরের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। চাষী-কারিগরের মনে হচ্ছে সে খোলা বাজারের পাইকারকে চাল আর কাপড় বিক্রি করছে, কিন্তু আদতে তার রাজস্বমূল্যেই কোম্পানি সেই চাষী-কারিগরের পণ্য কিনছে সে ধারণা তার তৈরি করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ কোম্পানি এই পণ্য কিনছে নিজের সিন্দুক থেকে একটা ফুটো কড়িও খরচ না করেই। যে জন্য চাষী-কারিগরদের থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পণ্য জোগাড় করে কোম্পানি মেট্রোপলিটনে পণ্য রপ্তানি করতে পারছে। সেযুগে ৫০ টাকায় পাওয়া যেত ৫ পাউন্ড।

উৎসা তাঁর প্রবন্ধে বিশদে ব্যাখ্যা করে বলছেন কীভাবে শস্তায় ইংলন্ডে ভোক্তাদের জন্যে তুলনামূলক শস্তায় পণ্য তুলে দিচ্ছে উপনিবেশ। বাংলার বাজার থেকে বাংলার রাজস্ব দিয়ে যে ৫ পাউন্ডের বিনিময়ে কাপড় আর চাল ইংলন্ডে বন্দরের ভাড়া, বীমা, ব্যবসায়ীর লভ্যাংশ ইত্যাদি দিয়ে সে মোটামুটি ৭.৫ পাউন্ডে পণ্য দুটো মেট্রোপলিটনের ভদ্রবিত্ত ক্রেতার হাতে তুলে দিচ্ছে। তবে ইংলন্ডে বাংলার কাপড় আমদানি নিষিদ্ধ থাকায় সে নিজেদের দেশে বিক্রি না করতে পারা কাপড় বিদেশে রপ্তানি করত। যদিও গবেষকেরা বলছেন ইংলন্ডের ভোক্তাকে যেহেতু পুরো অর্থ ব্যয় করেই পণ্যটা কিনতে হচ্ছে, তাই এই পণ্যটা বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে না, এই পণ্যের উদ্বৃত্ত মূল্য একচেটিয়া কোম্পানির সিন্দুকে ঢুকছে। মাথা

রাখতে হবে ফ্রান্সের তুলনায় ইংলন্ডে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পণ্যের দাম অনেক বেশি ছিল, তাই P. Thomas, 'A Quantitative Approach to the Study of the Effects of British Imperial Policy upon Colonial Welfare: Some Preliminary Findings'; P.R.P. Coelho, 'The Profitability of Imperialism: The British Experience in the West Indies 1768-72'; P.K. O'Brien, 'The Costs and Benefits of British Imperialism, 1846-1914' মত সমালোচকদের বক্তব্য ইংলন্ড যদি উপনিবেশ রাখার দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারত, তাহলে হয়ত ইংলন্ডের ভোক্তারা আরও কম দামে পণ্য পেত (এর আগে আমরা তাদের গুরু ঠাকুর ডিজরেলির বক্তব্য তুলে ধরেছি)। উৎসা বলছেন, সমালোচকেরা ভুলে যান ইংলন্ডে যদি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পণ্যের বাজার/চাহিদা না থাকত এবং মেট্রোপলিটনের ক্রেতার কোম্পানির ধার্য করা মূল্যে পণ্য কেনার মানসিকতা না থাকত তাহলে তো ১০০ বছর আগে কোম্পানির বাংলা বাজার থেকে বাংলার পণ্য কেনার ব্যবসাটাই শুরু হত না। ব্যবসায়ীর বিপুল লাভ আর পণ্যের অস্বাভাবিক দাম নিয়ে আলোচনা মূল্যহীন কারণ এই উদ্বৃত্ত'র একটা টাকাও উপনিবেশে ফিরে আসে না।

উৎসা বলছেন, মাথায় রাখতে হবে উপনিবেশের চাষী-কারিগর যে পরিমাণ রাজস্ব দিচ্ছে, সেই পরিমাণে পণ্য মেট্রোপলিটনে রপ্তানি হচ্ছে; এবং আগের অনুচ্ছেদে বলেছি মেট্রোপলিটনে বিক্রি হওয়া চাষী-কারিগর পণ্যের একটাও ফুটো কড়ি উপনিবেশে ফিরে আসছে না। উত্তর গোলার্ধের ক্রেতাদের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পণ্য কেনার তীব্র ইচ্ছে, ১৮৪০ পর্যন্ত যে সব পণ্যদ্রব্য আমদানি করে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়, সেই আমদানি-রপ্তানি ভারতবর্ষ এবং ব্রিটেনের ঘাটতি বাণিজ্য তৈরি করলেও, সেই ঘাটতি পূরণে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে কোনও অর্থ দিতে হয়নি, ফ্রান্সের সঙ্গে চলতে থাকা বাণিজ্য ঘাটতি কিন্তু ব্রিটেনকে দামি ধাতুর (সোনা) বিনিময়ে অথবা মুদ্রা ধার করে অথবা ধাতু-মুদ্রা মিলিয়ে মিশিয়ে সেই ঘাটতি শোধ করতে হয়েছে। ১৭৫৭ পর্যন্ত এইভাবে ইংলন্ডের বাণিজ্য ঘাটতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মেটাতে হয়েছে বাংলা নিজামতের কাছারিতে সোনা বা রূপোর বিনিময়ে। পলাশির পরে কোম্পানি এত অর্থ রোজগার করল যে তাকে বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে আর ইওরোপ থেকে বিন্দুমাত্র সোনা-রূপো আনতে হল না। ১৭৬৫-এর পরে উপনিবেশিক বাংলার চাষী-কারিগরের রাজস্ব দিয়েই পণ্য জোগাড়ের যুগ শুরু হবে।

বাংলা থেকে ব্রিটেনের কাপড় এবং চাল রপ্তানিতে কোম্পানির একটা টাকাও খরচা করতে হচ্ছিল না তার বড় কারণ হল, আমরা আগেই উৎসার উদাহরণে দেখিয়েছি কীভাবে উপনিবেশে বাংলার চাষী-কারিগরের রাজস্ব দিয়েই কোম্পানির মধ্যস্থরা তাদের রপ্তানি পণ্য জোগাড় করছিল। তাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে চাষী-কারিগর তার পণ্য কোম্পানির পাইকারদের কাছে বিক্রি করে যে অর্থ পাচ্ছে, সেটা আদতে চাষী-কারিগরের দেওয়া রাজস্ব। আদায় করা রাজস্বজাত অর্থ ব্যবহার করে বিনামূল্যে পাওয়া সমতুল পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত তৈরি করার এই চতুর ব্যবস্থাই উপনিবেশিক সম্পদ লুঠের মূল ভিত্তি। উৎসা, রমেশ দত্তের উপনিবেশিক লুঠ বোঝার পদ্ধতি অনুসরণ করে বলছেন, একটি ফুটো কড়ি খরচ না করে পণ্য জোগাড় করে লাভবান হওয়ার এই পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে শুধু কোম্পানিই বিপুল লাভবান হল না, কোম্পানি ব্রিটেনকেও সমৃদ্ধ করল। কারণ

মেট্রোপলিটনে আমদানির পণ্য জোগাড় করতে এক পেনি খরচ করতে হল না; উল্টে তারা আমদানি করা পণ্য ফ্রান্স বা অন্য দেশে রপ্তানি করে ফ্রান্সের সঙ্গে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার সুযোগ পেল। বাংলায় আনা রূপো দিয়ে সে চিনে ব্যবসা শুরু করল। এর পরে বাংলার চাষীর চাষ করা আফিম, বাংলার চাষীদের দেওয়া রাজস্ব ব্যয় করে কিনে চিনে রপ্তানি করে বিপুল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তৈরি করবে। উৎসা লিখছেন, For balancing external accounts, India's export surplus earnings were fully offset by imposing the sterling value of the very same total of invisible debit items comprising the politically determined tribute, that was already set aside in the Indian budget as 'expenditure abroad'।

উৎসা বলছেন, ভারতবর্ষ উপনিবেশ না হয়ে সার্বভৌম দেশ হলে, সে যা ছিল ১৭৫৭-এর আগের আমলে, এই রপ্তানি সূত্রে পাওয়া অর্থ মুর্শিদাবাদ নিজামতের কাছারিতে জমা হত, যার ফলে তার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পণ্য কেনার সুযোগ বাড়ত। যে উপনিবেশে রাজস্ব আদায়কে কোম্পানি তার পণ্য কেনার কাজে ব্যবহার করছে, বাংলা যদি উপনিবেশ নাই হত, সেই রাজস্ব তার নিজের দেশে খরচ হত। লুঠ নিয়ে লেখাপত্র করা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদেরা মূল ইস্যুগুলোকে গুলিয়ে দিয়ে লুঠের সঙ্গে রাজস্বজাত অর্থ দিয়ে পণ্য কেনার বিষয়টা আলোচনাতেই আনেন না, যদিও তারা জানেন কাণ্ডটা কীভাবে ঘটেছে। সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায় এবং সেই অর্থ লুঠ করে মেট্রোপলিটনে পাঠাবার লক্ষ্যে উপনিবেশিক শক্তি স্থানীয় সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছে, যে লক্ষ্য তার আগের সময়ের পাল, সেন, সুলতানি, মুঘল বা নবাবি শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল না, যে জন্যে উপনিবেশপূর্ব রাষ্ট্র শক্তি প্রচুর রাজস্বমুক্ত জমির অধিকার বিলোতে পেরেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, সম্পত্তির নিরঙ্কুশ অধিকার তৈরি করে রাজস্ব আদায় করেছে। অন্য দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে দাস খাটিয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠা বাগিচা মালিকেরা লাভ তৈরি করত মাথাপিছু দাসেদের ওপর ট্যাক্স (স্লেভ রেন্ট) বসিয়ে, সে অর্থ মেট্রোপলিটনে রপ্তানি করে পুঁজি সংহত করেছে। আয়ারল্যান্ডের জমিদারেরা স্থানীয় চাষীদের ওপর বিপুল রাজস্বভার আরোপ করে সেই সম্পদ লুঠ করে ইংলন্ডে নিয়ে গেছে। দাসেদের ওপর ট্যাক্সই হোক, সম্পত্তির ওপর ট্যাক্সই হোক, বা দুটোকে মেলানোমেশানো উদ্বৃত্ত আদায়ই হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য উপনিবেশের উদ্বৃত্ত সম্পদ লুঠ করে মেট্রোপলিটনে রপ্তানি করছে।

রমেশচন্দ্র দত্তের দেখানো পথে হেঁটে শতাব্দ পরের গবেষক উৎসা বলছেন, ভারতবর্ষ থেকে কোম্পানির রাজস্বজাত অর্থ লুঠ প্রক্রিয়া ছিল সরাসরি এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মত খুল্লমখুল্লা। রাজস্ব আদায়ের খরচ বাদ দিয়ে পড়ে থাকা অর্থের এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার হয়েছে রপ্তানি পণ্য জোগাড়ে, যার মধ্যে কাপড় আর খাদ্যদ্রব্যের অংশিদারি ছিল সর্বাধিক। মেট্রোপলিটন নিজের প্রয়োজনের চাইতে উপনিবেশ থেকে অনেক বেশি পরিমাণে পণ্য আমদানি করেছে; তার একাংশ নিজেদের দেশে ব্যবহারের জন্যে রেখে বাকি অংশ বিদেশে রপ্তানি করেছে আরও উদ্বৃত্ত তৈরির পরিকল্পনায়। যেহেতু ১৭০০ থেকে ইংলন্ডে দক্ষিণ এশিয় সুতির কাপড় আমদানিতে নানান পর্বে, নানান ধরণের নিষেধাজ্ঞা

জারি করা হচ্ছিল, এক সময়ে গিয়ে সেই আমদানিতে এত শুল্ক আরোপ করা হয় যে, লন্ডনে বাংলা থেকে আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হয়। বাংলার কাপড় নিয়ে লন্ডনের গ্রামাঞ্চলে নিজের কারখানায় ব্লক প্রিন্ট করা কারিগরকে ইংলন্ডে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া থেকে চাষী-কারিগরের দেয় রাজস্বে তাদের পণ্য জোগাড় করে, সেই পণ্য ব্রিটেনের বন্দরের গুদামে জমা করে রেখে, তার ওপরে ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত দাম চাপিয়ে, পুরোটাই রপ্তানি করা হয়েছে কন্টিনেন্টাল ইওরোপ, ক্যারিবিয়া এবং আফ্রিকার নানান ১৭৭৪-এ নতুন ধরণের মাকু আর ১৭৮০-এ কেন্দ্রিভূত বড় সুতোর কারখানা তৈরি হওয়ার পর থেকে ক্রমশ সুতো আর সুতিবস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠতে থাকে কিন্তু কাপড়ের ওপর চাপানো বিপুল আমদানি শুল্ক উঠতে উঠতে ১৮৪৬ হয়ে যায়, ততদিনে ম্যানচেস্টারের কাপড়/সুতো বাংলার কাপড়ের বাজার দখল নিয়েছে। ইংলন্ডে বাংলার সুতি পণ্যের রপ্তানি বাজার শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে।

সমস্যা হল 'কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া'র কোনও লেখকই ১৭০০ থেকে ১৮৪৬ - দেড়শ বছরের ব্রিটেনের বস্ত্র সংরক্ষণে চাপানো বিপুল শুল্ক ইস্যু আলোচনাই করেননি। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ইতিহাসে শিল্পায়নে সুতিবস্ত্র এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ইস্যু আলোচনায় আসেনি। দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধিকাংশ লেখক কেম্ব্রিজিয় ইতিহাসকেই ভিত্তি করেছেন।

উত্তর (গোলার্ধ) ও দক্ষিণ (গোলার্ধের) উৎপাদন সক্ষমতার অসামঞ্জস্য

উৎসা পট্টনায়েক এই পর্বে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আলোচনা করেছেন। ইউরোপের একটা বড় অংশে বছরে একটা বড় সময়জুড়ে বরফে ঢাকা থাকে। সে সব নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কোনও এক দেশের পক্ষে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কোনও এক দেশ নিয়ন্ত্রণ করার অর্থই হল, তার ভাষায় অক্ষয় সোনার খনির অধিকার অর্জন। এই রকম দেশ দখলের অধিকার সোনার খনির অধিকারের চেয়েও অনেক বড় লাভের, কারণ খনিতে সোনার সঞ্চয় কখনও না কখনও ফুরোবে, কিন্তু যতক্ষণ না কৃষক কারিগর অতিরিক্ত শোষণের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস না হয়ে যাচ্ছে, ততদিন তাদের উৎপাদনের ওপরে শুল্ক চাপিয়ে পৌনপুনিকভাবে বিপুল পরিমাণ কর আদায় সম্ভব। উপনিবেশ এই লুঠেরা প্রক্রিয়াতেই কাজ করে। তাছাড়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে উপনিবেশ তৈরি করা উত্তর গোলার্ধে দেশগুলো প্রাকৃতিকভাবে নিজেদের দেশে উৎপাদন না করতে পারা ফসল যেমন আখের চিনি, চাল, ট্যাপিওকা, নানান ধরণের মশলা; কফি, চা, কোকো, তামাকের মতো স্নায়ু উদ্দীপক; সরষে, নারকেল, চীনাবাদাম, তিসি, পামের মত নানান ধরণের উদ্ভিজ্জ তেল; গাঁজা, আফিমের মত ওষুধ বা মাদকদ্রব্য; বড় কারখানার কাঁচামাল যেমন নীল, পাট, সিসাল (আনারসের এক প্রজাতি) তুলো; বন থেকে বা/এবং পরিকল্পিত উপায়ে কাঠ পাওয়ার জন্যে তৈরি বাগান থেকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় শক্ত কাঠ (সেগুন, মেহগনি, রোজউড, আবলুস) পাওয়ার জন্যে সেই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় (এবং উপক্রান্তীয়) দেশের চাষীকে আরও বেশি বেশি করে উৎপাদন করতে বাধ্য করতে পারে। এ ছাড়াও আরও হাজার হাজার পণ্য উৎপাদন হতে পারে, যা বহু চেষ্টা করলেও পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের ঠাণ্ডা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলোয় স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন সম্ভবই না।

উৎসার বক্তব্য, উত্তর গোলার্ধের ঠাণ্ডা নাতিশীতোষ্ণ ইউরোপ তখনও

(উপনিবেশিক আমলে), এমনকি বর্তমান সময়েও, এই পণ্যগুলির 'আমদানি-বিকল্প' তৈরি করতে পারেনি, ফলে সেই কারণেই তারা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোকে নিজেদের তাঁবেতে ধরে রাখতে চায়, সে সব দেশ দখলে রাখার পরিকল্পনা তৈরি করতে তারা নিজেদের চাগিয়ে রাখে। বিপরীতভাবে, নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলোয় এমন কোনও পণ্য সম্ভার আজও তৈরি হয়নি, যা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলো নিজেদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে বিশালভাবে আমদানি করতে উৎসাহী হতে পারে; কারণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলো চাহিদার প্রায় সমস্ত কিছু নিজেরা উৎপাদন করে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলো বছরে কমপক্ষে দু'বার ফসল চাষ করে, অন্যদিকে শীতল নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলো সাধারণত একবারের বেশি ফসল তুলতে পারে না; দক্ষিণের অধিকাংশ দেশ বর্ষায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফসল উৎপাদন ছাড়াও শীতকালেও সব নাতিশীতোষ্ণ দেশে উৎপাদিত প্রায় সমস্ত ধরণের ফসল উৎপাদন করার দক্ষতা ধরে। সম্রাট তৃতীয় জর্জ, চীনা সম্রাট কিয়ানলং (Qianlong)-এ দরবারে বাণিজ্য ছাড়ের দাবিতে দৌত্য পাঠিয়েছিলেন। চিনা সম্রাটের ঐতিহাসিক মন্তব্য ছিল, 'আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত পণ্য অনেক অনেক বেশি বেশি করে উৎপাদন করে এবং আমাদের সীমানায় পণ্যের বিন্দুমাত্র অভাব নেই।'

উৎসার কঠোর মন্তব্য, উৎপাদন সক্ষমতার অসামঞ্জস্যের এই গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত বাস্তবতাই, ইউরোপীয় দেশগুলোর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোকে নিজেদের তাঁবেতে রাখার প্রবল প্রচেষ্টা এবং সে সব দেশগুলোর উৎপাদকদের বন্দুকের মুখে দাঁড় করিয়ে, ইওরোপিয় শর্তে বাণিজ্য করতে বাধ্য করার ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার ব্যাখ্যা রিকার্ডো তাঁর তত্ত্বে উপেক্ষা করেন। তবে তিনি এই রাজনৈতিক পরিবেশটি স্পষ্ট অনুমান করতে পেরেছিলেন।

উৎসা রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধার মডেল বা কম্পারেটিভ আডভান্টেজ মডেলের অসারতা ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি বলছেন 'দুটো দেশ দুটো পণ্য উৎপাদন করে' - আদতে তার সিদ্ধান্ত 'সমস্ত দেশ সমস্ত পণ্য উৎপাদন করে'। এই তত্ত্বে রিকার্ডো দেখানোর চেষ্টা করলেন 'কম্পারেটিভ কস্ট আডভান্টেজ' বা তুলনামূলক উৎপাদন ব্যয়, প্রাধান্য অনুসারে দক্ষতার বিশেষীকরণ করে এবং পারস্পরিক সুবিধের পরিবেশ তৈরি করে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তিনি যে বস্তুগত সত্যটি উপেক্ষা করলেন সেটা হল, উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ ইওরোপিয় দেশগুলিতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পণ্য উৎপাদনের একক ব্যয় একেবারেই সংজ্ঞায়িত করা যায় না, কারণ সেখানে এই জাতীয় পণ্য উৎপাদনই হয় না, তার উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য। তাই তুলনামূলক উৎপাদন ব্যয় জনিত সুবিধার কথা ছেড়েই দিন, বিশুদ্ধ (absolute) খরচও সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। যে কোনও দামে বিপুল পরিমাণে পণ্যের সরবরাহ শূন্য, এবং আজও এটা চরমতম সত্য। রিকার্ডোর তত্ত্বের মৌল বস্তুগত ভ্রান্তিকে বলা যায় 'কনভার্স ফ্যালাসি অব এক্সিডেন্ট', যেখানে তিনি একটি বিশেষ ক্ষেত্র অনুমান করে নিলেন (উভয় দেশই উভয় পণ্য উৎপন্ন করে) এবং সেই অনুমানকে ব্যবহার করলেন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত তৈরি করার কাজে (বাণিজ্য পারস্পরিকভাবে উপকারী হয়) এবং তাকে এমন এক ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করলেন যেখানে মৌল অনুমানটাই অসত্য। যেহেতু রিকার্ডোর মৌল অনুমানই অসত্য, তাই পারস্পরিক সুবিধার সিদ্ধান্তটি ঠিক হতে পারে না। উল্টোদিকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করা যায়, কম শক্তিশালী দেশ, রপ্তানি ফসলে

বিশেষীকরণ করতে বাধ্য হলে, তার আঞ্চলিক উৎপাদন বৈচিত্র হারিয়ে যায় (যেহেতু ফসলী এলাকা বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রয়োজন, যে বিনিয়োগ পাওয়া যায় না), যার ফলে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে যায়। দেশে অবাধে বাধ্যতামূলক বিদেশি পণ্য আমদানির ফলে দেশিয় উৎপাদন কমতে থাকে, বেকারি বাড়তে থাকে এবং এই বেকারদের কাজে লাগাবার জন্যে খালি জমি পড়ে থাকে না।

উৎসা বলছেন, বাস্তবতা হল, উত্তর গোলার্ধের জনগণের কাছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পণ্যের চাহিদা যতটা ছিল, ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা তত ছিল না। কারণ সেই সব অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পণ্য উৎপাদিত হত না - এবং এর চাহিদাও ছিল অনেক বেশি। ১৭৬৫ থেকে ১৮২১-এর সময়কালে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পণ্যের মোট আমদানির উল্লেখযোগ্য অংশের পুনঃরপ্তানি, ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ রপ্তানির ক্রয় ক্ষমতাকে একলপ্তে ৫৫ শতাংশ বাড়িয়েছে, বলছেন উৎসা। ব্রিটেনের রপ্তানি করা পণ্যের চার-পঞ্চমাংশ (৮০ শতাংশ) ছিল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল থেকে আমদানি করা পণ্য এবং এই পণ্যগুলো পুনরায় রপ্তানি করা হত প্রধানত কন্টিনেন্টাল ইউরোপ জুড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নেদারল্যান্ডসের আমদানি করা পণ্যের পুনঃরপ্তানি তার অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ছাড়িয়ে যায়। ফলে তিনি বলছেন, উপনিবেশ লুণ্ঠনের ফলে মেট্রোপলিটনের দ্বিগুণ সুবিধা তৈরি হল, জনগণ নিজের ব্যবহারের জন্য অসীম মূল্যবান গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পণ্য প্রায় বিনামূল্যেই পেল, আর মেট্রোপলিটনগুলোয় যে সব নাতিশীতোষ্ণ দেশের পণ্যের অভাব ছিল, এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পণ্যের রপ্তানি মূল্যের বিনিময়ে সে সব ঘাটতির পণ্য আমদানি করার সুযোগ তৈরি হল।

১৭৮৪ থেকে ১৮২৬-এর মধ্যে মোট ব্রিটিশ আমদানির অর্ধেক ছিল এশিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আয়ারল্যান্ডের পণ্য। এশিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপনিবেশগুলি থেকে ব্রিটেনে আমদানি করা উদ্বৃত্ত (যাতে ট্যাক্স আর ক্রীতদাস ভাড়া ধরা ছিল বলেই

রমেশচন্দ্র দত্তের হিসেবে ১৯০ বছরে যে ৬২০ মিলিয়ন পাউন্ড লুঠ হয়েছে, তাতে যদি মাত্র সরল ৫% সুদ প্রয়োগ করা যায়, তার পরিমাণ হবে ২০১৬র ভারতের জিডিপির ২/৩ ভাগ, ২০১৫র যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির ৪৫%; আর মন্টগোমারি মার্টিনের নিদানে ১২% সুদে সে পরিমাণ হয় ২০১৫র ব্রিটিশ জিডিপির ৬০০০ গুণ ১২৯৩০.৫৪ ট্রিলিয়ন পাউন্ড = ভারতীয় টাকায় ১০,৫৯,৫১,১০,০০,০০,০০০.০২ কোটি x ১২৯৩০.৫৪ টাকা

এক্সটারনাল লায়েবিলিটি বা বিদেশে ধার শূন্য হয়ে যায়), ১৮০১ থেকে ১৮২১ পর্যন্ত ব্রিটেনের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫.৩ থেকে ৬.১ শতাংশের মধ্যে ছিল। উৎসা রালফ ডেভিসের তথ্য তুলে জানাচ্ছেন ১৭৮৪-১৭৮৬ এবং ১৮২৪-১৮২৬-এর মধ্যেকার সময়ের অধিকাংশ উপনিবেশের কাছে ত্রিবার্ষিক মানে ব্রিটেনের মোট জিডিপি ঘাটতি ছিল ৪ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে।

ব্রিটেনের বাণিজ্য তথ্য ব্যবহার করে ১৭৬৫ থেকে ১৮৩৬-এর পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে ড্রেনের/লুঠের পরিমাণ মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারি। বি আর মিচেল, ডিনের তথ্য এবং এ এইচ ইমলাহের ১৭৬৫ থেকে ১৮৩৬ সালের টাইমসিরিজের

মূল্য সূচক ব্যবহার করেছিলেন উৎসা এশিয়া থেকে ব্রিটেনে আমদানির উদ্বৃত্তের পরিমাণ থেকে ড্রেন/লুঠের পরিমাপ করতে। ডেভিসের তথ্য থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত চিন বাণিজ্য মূল্য বাদ দিয়ে তিনি বলছেন, আমরা একটা হিসেবে উপনীত হতে পারি।

১৭৬৫-১৮৩৬এর মধ্যে বর্তমান মূল্য ব্রিটেনের আমদানি উদ্বৃত্ত ছিল মোট ২৭০.২৫৪ মিলিয়ন পাউন্ড। যে কোনো সাম্প্রতিক তারিখ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে প্রতি বছরের ড্রেন/লুঠের অনুমান ধরে এবং স্বতন্ত্র পরিসংখ্যান যোগ করে উৎসা লুঠ, বর্তমান মূল্যে হিসেব করেছেন। তিনি বলছেন, আমরা একটি শর্ট-কাট পদ্ধতি গ্রহণ করি যা একটু আলাদা রকমের হবে। তিনি বলছেন আমরা এই আলোচ্য (১৭৬৫-১৮৩৬) সময়ের মাঝামাঝি পর্ব থেকে থেকে ৫ শতাংশ সুদের হারে বর্তমান পর্যন্ত মোট লুঠের পরিমাণ কষেছি - (১) ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত এবং (২) ২০২০ পর্যন্ত সেই কাজটা বাড়িয়ে নিয়ে গেছি। ১৭৬৫-১৮৩৬-এর মধ্যেকার সময় ১৮০০ সাল ধরে সব থেকে কম ৫ শতাংশ সুদের চক্রবৃদ্ধি হারে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত লুঠ হয়েছে (১) ৩৬৯.৬৫ বিলিয়ন পাউন্ড এবং (২) ২০২০ সাল পর্যন্ত ১২৪০০ বিলিয়ন পাউন্ড। মধ্যবিন্দু না ধরে যদি বছর ধরে ধরে হিসেব করতাম, তাহলে এই হিসেবটা স্বাভাবিকভাবে অনেকেই বড় হত বলছেন তিনি (Taking the midpoint of the total drain period as the initial year understates the estimate we would get from a proper compounding of each year's figure to the terminal year)।

মন্টগোমারি মার্টিনের মত সাম্রাজ্য পর্যবেক্ষক, ১৮৩৮-এর বইতে এবং ১৮৪০-এর সিলেক্ট কমিটির সামনে লুঠের প্রমাণ দেওয়ার সময়, ভারত থেকে ব্রিটেনের ড্রেন/লুঠের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তাঁর হিসাবে ৩ মিলিয়ন পাউন্ড বার্ষিক হোম চার্জের সঙ্গে চালু ১২ শতাংশ সুদের হার জুড়ে ১৮৩৩ পর্যন্ত তিন দশকের মোট লুঠ মূল্য হয় ৭২৪ মিলিয়ন পাউন্ড। তিনি বলছেন আগের পঞ্চাশ বছরের গড় বার্ষিক ড্রেন/লুঠ অঙ্ক ২ মিলিয়ন ডলারের সামান্য বেশি, এবং তাতে এই সুদের হার প্রয়োগ করা হলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় আকাশ ছোঁয়া ৮৪০০ মিলিয়ন ডলার - তিনি লিখছেন ব্রিটেন থেকে প্রতি বছর এই পরিমাণ অর্থ ড্রেন/লুঠ করা হলে ব্রিটেন খুব তাড়াতাড়িই বাধ্যতামূলকভাবে গরীব হতে বাধ্য, অথচ যে ভারতবর্ষের শ্রমিকের মজুরি ২ থেকে ৩ পেনি, সে দেশের ওপর এই লুঠের প্রভাব কী হতে পারে আমরা কোনও দিন ভেবেছি কি (So constant and accumulating a drain even on England would soon impoverish her; how severe then must be its effects on India, where the wages of a labourer is from two pence to three pence a day?)

বিশ্বেন্দু নন্দ

(এখানেও দেখতে পারেন https://monthlyreview.org/2021/02/01/the-drain-of-wealth/)

মূলত বিনা শুল্কে বাণিজ্য বা 'দস্তক'-এর অপব্যবহারকে কেন্দ্র করে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের পারস্পরিক সম্পর্কের যে চূড়ান্ত অবনতি ঘটে, তারই চরম পরিণতি ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত পলাশির যুদ্ধ। এ কথা সত্যি যে, যুদ্ধের ব্যাপকতা ও হতাহতের সংখ্যার বিচারে পলাশির যুদ্ধ নেহাতই হাতাহাতির বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু পলাশি মানেই নিছক যুদ্ধ নয়। বরং ভারতবর্ষের, বিশেষত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের পট পরিবর্তন প্রসঙ্গে পলাশির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যুদ্ধে জয়লাভের ফলে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (এর পরে কেবল 'কোম্পানি' লেখা হবে) বাংলার নবাবকে তাদের অনুগত দাসে পরিণত করে এবং বাংলার প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। এর পরিণতিস্বরূপ এক দিকে তারা যেমন নির্দ্বিধায় বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করতে থাকে, অন্য দিকে তেমনই বাংলা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশি বণিকদের হটিয়ে দিয়ে তারা সারা বাংলার বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে।

তবে শুধু বাংলার বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করেই কোম্পানির দৌরাত্ম্য শেষ হয়ে যায়নি, বরং এর সঙ্গে যুক্ত হয় নির্বিচার লুঠতরাজও। পলাশি পর্ব সাঙ্গ হতেই ক্লাইভ ও তাঁর সহচররা যে বিপুল ধনসম্পদ লুঠ করেন, সে বিষয়ে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন:

> কোম্পানীর কলিকাতার কর্ম্মচারিগণ এই উপলক্ষে যে অর্থলাভ করেন, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কমন্‌স সভার কমিটী তাহার এক হিসাব দিয়াছেন; - গবর্নর ড্রেক্ ২৮০০০০; কর্ণেল ক্লাইব্ মেম্বরস্বরূপে ২৮০০০০, সেনাপতি ২০০০০০, বিশিষ্ট দান ১৬০০০০০ [মোট ২০ লক্ষ ৮০ হাজার]; ওয়াট্‌স্ মেম্বর ২৪০০০০, বিশিষ্ট ৮০০০০০ [মোট ১০ লক্ষ ৪০ হাজার]; মেজর কিল্‌প্যাট্রিক্ ২৪০০০০, অতিরিক্ত ৩০০০০০ [মোট ৫ লক্ষ ৪০ হাজার]; ম্যানিংহাম্ ২৪০০০০; বিচার ২৪০০০০; অন্য ছয় জন কাউন্সিলের সভ্য ৬০০০০০; ওয়ালস্ ৫০০০০০; স্ক্রাফ্‌টন্ ২০০০০০; লুসিংটন্ ৫০০০০। সম্পূর্ণ স্বীকৃত বা বিশেষ প্রমাণপ্রাপ্ত টাকারই ইহাতে উল্লেখ আছে; ষড়যন্ত্রের নেতৃদল অন্যরূপে কত পাইয়াছেন, কে তাহার হিসাব রাখিয়াছে![১]

এই লুঠের পরিমাণ আদৌ তাঁর মনগড়া নয়। লর্ড ক্লাইভের পদত্যাগের পরে, কোম্পানি তাঁর অঢেল সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার জন্য তাঁর বিচারের বিষয়ে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে আবেদন করে। পার্লামেন্টের তদন্ত শেষে ১৭৭২ সালে এই লুঠপর্ব সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশিত হয়, তার ভিত্তিতেই কালীপ্রসন্ন এই লুঠের নিখুঁত বিবরণ দেন।

এই লুঠ হওয়া মোট ৫৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার মূল্যমান আজকের দিনে আনুমানিক কত হতে পারে? নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তাঁর 'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে জানিয়েছেন, ১৭৬৯ সালে এক মণ চালের দাম ছিল ৫ থেকে ৬ আনা।[২] অর্থাৎ কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর আগের বছরেও বাংলায় টাকায় ৩ মণ চাল পাওয়া যেত। ১৭৫৭ সালে সেটাকে অনায়াসে ৫ মণ ধরা যেতে পারে।

এর অর্থ, সেই আমলে টাকাপিছু ২০০ কেজি চাল পাওয়া যেত। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী প্রতি কেজি চালের দাম যদি ৫০ টাকা ধরা হয়, তাহলে ২০০ কেজি চালের দাম হবে ১০ হাজার টাকা। এই হিসাবে ১৭৫৭ সালের ১ টাকা আজকের মূল্যমান অনুযায়ী ১০ হাজার টাকা। কাজেই তৎকালীন ৫৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বর্তমান সময়ে ৫ হাজার ৭৭০ কোটি টাকার সমান।

পলাশি যে কেবল কোম্পানিকে অসীম রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী করে তুলেছিল তা-ই নয়, রাতারাতি তাদের কাছে খুলে গিয়েছিল অবাধ অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের বহুপ্রার্থিত সদর দরোজাটিও। সিরাজউদ্দৌলার পতনের পরে কোম্পানির কাছে নবাব-তৈরির কারবার এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। পলাশির যুদ্ধ শেষে মীরজাফরকে নবাবের গদিতে বসানোর মূল্যস্বরূপ কোম্পানির অফিসার ও সেনাবাহিনী আদায় করে ১২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৭৫ পাউন্ড। এর মধ্যে বাংলায় একটি সম্পদশালী জায়গির ছাড়াও ক্লাইভ নিজে নেন ৩১,৫০০ পাউন্ড। ১৭৬০ সালে মীরজাফরের পরিবর্তে মীরকাশিমকে নবাবি দিয়ে তারা আদায় করে ২ লক্ষ ২৬৯ পাউন্ড। এর মধ্যে ভ্যান্সিটার্ট নেন ৫৮,৩৩৩ পাউন্ড। ১৭৬৩-তে মীরকাশিমের বদলে মীরজাফরকে দ্বিতীয়বার নবাবের মসনদে বসিয়ে কোম্পানির উপঢৌকনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ১৬৫ পাউন্ড। তার পরে ১৭৬৫ সালে তাঁর অবৈধ পুত্র নাজিমুদ্দৌল্লাকে নবাব বানানোর ফলে, কোম্পানির আমদানি হয় আরও ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৫৬ পাউন্ড। এইভাবে নবাব-সৃষ্টির দালালিস্বরূপ, তারা আট বছরে কেবল নজরানা বাবদ আদায় করে মোট ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬৬৫ পাউন্ড। এ ছাড়াও এই সময়কালে ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানি অতিরিক্ত আয় করে ৩৭ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৩৩ পাউন্ড।[৩] অর্থাৎ এই সুযোগে মাত্র ৮ বছরে কোম্পানি আত্মসাৎ করে মোট ৫৯ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৯৮ পাউন্ড বা প্রায় ৬০ লক্ষ পাউন্ড।

এর পাশাপাশি ১৭৬৬-তে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি কোম্পানির কর্মচারীদের ঘুষ নেওয়ার যে তালিকা প্রস্তুত করে, তাতে দেখা যায় ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ পর্যন্ত বাংলা ও বিহার থেকে কোম্পানির কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের মোট পরিমাণ ৬০ লক্ষ পাউন্ড।[৪] তদানীন্তন আমলে ১ পাউন্ড প্রায় ১০ টাকার কাছাকাছি ছিল। সে হিসাবে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড প্রায় ১২ কোটি টাকার সমতুল। তাহলে বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী কেবল নজরানা, ক্ষতিপূরণ ও ঘুষের সুবাদে কোম্পানির লুঠের পরিমাণ দাঁড়াবে (১২ কোটি X ১০ হাজার) টাকা বা আরও ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা।

যদিও মীরজাফর বা মীরকাশিম কোম্পানিকে কেবল উপহার-উপঢৌকন কিংবা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দিয়েই নিষ্কৃতি পাননি। বরং ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩ বছরের মধ্যে মীরজাফরের সঙ্গে গোপন চুক্তি মোতাবেক কোম্পানি কলকাতা থেকে দক্ষিণে সাগরপাড় পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের জমিদারিস্বত্ব লাভ করে। কোম্পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন ওই এলাকার নতুন নাম রাখা হয় ২৪ পরগণা। এই নতুন জমিদারি থেকে তারা বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা রাজস্ব লাভের স্থায়ী বন্দোবস্ত করে।[৫] এরপর মীরজাফরকে হটিয়ে মীরকাশিমকে নবাব বানিয়ে কোম্পানি আরও তিনটি অতি বিস্তীর্ণ জেলা বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের ওপর স্বত্বাধিকার লাভ করে। এই তিনটি জেলা থেকে তারা বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়।৬

পলাশি-পূর্ব বাংলা বরাবরই বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানির চেয়ে রফতানির ব্যাপারে এগিয়ে ছিল। বিশেষত ইউরোপের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কও ছিল যথেষ্ট অনুকূল। কারণ, ইউরোপে বাংলার পণ্যের বিপুল চাহিদা থাকলেও বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষে ইউরোপীয় পণ্যের বাজার ছিল খুবই সীমিত। ফলে বিনিময়ের জন্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি সোনারুপো আমদানি করতে বাধ্য হত এবং সেই সোনারুপো নবাবের টাঁকশালে নির্দিষ্ট বাটার বিনিময়ে বিক্রি করে সিক্কা টাকায় রূপান্তরিত করতে হত। অমিয় বাগচী জানিয়েছেন, ১৭১৬ সালে বাণিজ্যের জন্য কোম্পানি এ দেশে নিয়ে আসে ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৯০ পাউন্ড মূল্যের রুপো।[৭] এমনকি পলাশির অব্যবহিত পূর্বেও এ দেশের পণ্য কেনার জন্য, কোম্পানি বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সোনা ও রুপো আমদানি করত। কিন্তু পলাশি-পরবর্তী সময়ে এই ব্যাপক পরিমাণ লুঠ, নজরানা, ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়, উৎকোচ ও স্থায়ী রাজস্ব আদায়ের বদৌলত এ দেশে বাণিজ্যের জন্য কোম্পানির মূল্যবান ধাতু আমদানির প্রয়োজন চিরতরে বন্ধ হয়। তার পরিবর্তে বাংলাকে নির্বিচারে শোষণ করে, বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করে, সেই লুণ্ঠিত অর্থ ইংল্যান্ডের শিল্পে বিনিয়োগের জন্য মূলধনে রূপান্তরিত হয়।

তবে এত কিছুর পরেও, পলাশি-পরবর্তী বাংলাতে কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের দস্তক নিয়ে অপব্যবহারের রেশ দীর্ঘদিন জারি থাকে। ১৭৬০ সালে কোম্পানির সঙ্গে গোপন চুক্তির মাধ্যমে মীরজাফরকে হটিয়ে মীরকাশিম বাংলার সিংহাসনে বসার পরে, শুল্ক সংক্রান্ত কারণে তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বাধে। বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে নবাবি 'ফরমান' এনেছিলেন মীরকাশিম। অথচ কোম্পানির কর্মচারীরা আগের মতোই তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য দস্তকের অপব্যবহার চালিয়ে যেতে থাকে।

এই রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করে মীরকাশিম ১৭৬২-র মে মাসে গভর্নর ক্লাইভকে লেখেন:

> প্রত্যেকটি পরগণা, গ্রাম এবং বাণিজ্যকুঠিতে তারা [কোম্পানির গোমস্তারা] লবণ, সুপুরি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, গুণচট, আদা, চিনি, তামাক, আফিম কেনাবেচা করে। আমি যেগুলি লিখছি তা বাদেও অনেক জিনিস আছে, যেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। নির্ধারিত মূল্যের এক চতুর্থাংশ দিয়ে তারা রায়ত, ব্যাপারি ও অন্যদের মাল ও পণ্যদ্রব্য জোরপূর্বক নিয়ে চলে যায় এবং জোর জবরদস্তি মারফত তারা রায়ত প্রভৃতিদের এক টাকা দামের মালের জন্য পাঁচ টাকা দিতে বাধ্য করে। ...প্রতিটি জেলার পদস্থ আমলারা কর্তব্যপালন থেকে বিরত রয়েছেন। এই জুলুম এবং তদুপরি আমি আমার কর্তব্য থেকে বিরত হতে বাধ্য হওয়ার ফলে, আমার রাজকোষে বছরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার লোকসান হচ্ছে।[৮]

যদিও কোম্পানি তাঁর এই অভিযোগে কর্ণপাত করেনি। ফলে ক্ষুব্ধ মিরকাশিম দেশি-বিদেশি সমস্ত বণিকের ওপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক তুলে নেওয়ার আদেশ জারি করেন। এতে কোম্পানির বাণিজ্য স্বার্থ পুনরায় ব্যাহত হওয়ার কারণে তাদের সঙ্গে বক্সারের প্রান্তরে নবাবের প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর, ইংরেজবাহিনী বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে। দস্তকের অপব্যবহার নিয়ে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাবের সঙ্গে কোম্পানির

যে সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল, বক্সারের যুদ্ধে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে।

যুদ্ধের পরে ১৭৬৫-তে রবার্ট ক্লাইভ তৃতীয় ও শেষবারের মতো ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ওই বছরের ১২ অগস্ট, দিল্লির নামসর্বস্ব মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করেন তিনি। সন্ধির শর্ত অনুসারে, বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কোম্পানি বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি লাভ করে। ৩০ সেপ্টেম্বর কোম্পানির পরিচালক সভার (Board of Directors) সদস্যদের কাছে দেওয়ানি বাবদ লুঠের সম্ভাব্য হিসেব পেশ করে ক্লাইভ জানান:

> এই অধিকার অর্জনের পরে, আমার ধারণা, পূর্বে অধিকৃত বর্ধমান প্রভৃতি নিয়ে আপনার রাজস্বের পরিমাণ আগামী বছর ২৫০ লক্ষ সিক্কা টাকার থেকে খুব কম হবে না। এরপর সেটা অন্ততপক্ষে আরও কুড়ি বা তিরিশ লক্ষ [টাকা] বাড়বে। শান্তির সময় আপনাদের অসামরিক ও সামরিক ব্যয় কখনও ষাট লক্ষ টাকার বেশি হতে পারে না। নবাবের ভাতা ইতিমধ্যেই বিয়াল্লিশ লক্ষ এবং [মুঘল] বাদশার কর ছাব্বিশ লক্ষ [টাকায়] নামিয়ে আনা হয়েছে; যার অর্থ কোম্পানির লাভের পরিমাণ থাকবে ১২২ লক্ষ সিক্কা টাকা বা ১৬,৫০,৯০০ পাউন্ড স্টার্লিং।[৯]

দেওয়ানি লাভের পরে, কোম্পানি আরোপিত রাজস্বের উচ্চহার ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাজস্ব আদায়কারীদের নির্বিচার শোষণের যৌথ অত্যাচারের ফলে, আগের থেকে অনেক বেশি রাজস্ব আদায় হতে থাকে। প্রমথনাথ মল্লিক জানিয়েছেন, যেখানে ১৭৬৪-৬৫-তে বাংলা ও বিহার থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১৮,৬১,৭২৬ পাউন্ড, তা ১৭৬৫-৬৬ সালে ৩৬,৬৬,৩৪৭ পাউন্ড থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৬৮-৬৯-এ ৩৯,৩৩,২৫৫ পাউন্ডে এসে দাঁড়ায়।[১০]

নির্বিচার লুঠতরাজের পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ের স্থায়ী বন্দোবস্তের পরে, কোম্পানি একের পর এক বাংলার সমৃদ্ধশালী দেশজ শিল্পগুলিকে সমূলে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেওয়ানি লাভের অব্যবহিত পরে, লর্ড ক্লাইভ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অধিকার বাতিল করে দেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এই কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণের স্বার্থে অন্য একটি ঘুরপথের আশ্রয় নেন। ১৭৬৫ সালের অগস্ট মাসে তিনি কোম্পানির বড় আমলা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে 'Society of Trade' বা 'ব্যবসায়ী সঙ্ঘ' নামে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সঙ্ঘকে সারা বাংলার লবণ, তামাক ও সুপুরির অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দান করেন। ব্যবসার অধিকার লাভ করার পরেই এই সঙ্ঘ দেশীয় ব্যবসায়ীদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয়, এমনকি উৎপাদন ব্যবস্থাকেও তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলে।

মুঘল আমলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা লবণ কারিগর বা 'মালঙ্গি'-দের সঙ্গে টাকা দাদন দিয়ে চুক্তি করতেন এবং তাঁদের থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ সংগ্রহ করে সারা দেশে লবণ সরবরাহ করতেন। কিন্তু ব্যবসায়ী সঙ্ঘের বিশেষ নির্দেশে মালঙ্গিদের সঙ্গে দেশীয় ব্যবসায়ীদের সমস্ত যোগাযোগ নিষিদ্ধ হয়। পাশাপাশি জমিদারদের থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়, তাঁদের জমিদারির মধ্যে উৎপন্ন লবণ কেবল কোম্পানি ছাড়া অন্য কারও কাছে বিক্রি করা চলবে না। ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা লবণের ব্যবসা থেকে সরে আসতে বাধ্য হন

এবং মালঙ্গিরা ব্রিটিশ বণিকদের একচেটিয়া শোষণের শিকারে পরিণত হন।

বিশেষত লবণের উৎপাদন ও বিক্রির ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করার ফলে, কোম্পানি লবণের ক্ষেত্রে উন্মত্ত লুণ্ঠন শুরু করে। এই কারণে বাংলায় লবণের মূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। উইলিয়াম বোল্টস-এর মতে, নবাব আলিবর্দি খাঁর শাসনকালে প্রতি ১০০ মণ লবণের মূল্য ছিল ৪০ টাকা থেকে ৬০ টাকা।[১১] কিন্তু লবণের ব্যবসায়ী হিসাবে কোম্পানির আবির্ভাবের ফলে, ১৭৬৫ সালে ১০০ মণ লবণের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ১২৫ টাকা। পরবর্তী দু'বছরে তা বেড়ে হয় যথাক্রমে ২৪৭ টাকা ও ২৩১ টাকা।[১২] তদুপরি ১৭৬৬-তে লবণের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে কোম্পানি বার্ষিক ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত শুল্ক অর্জন করে। এইভাবে মাত্র দু'বছরের মধ্যে কোম্পানি কেবল লবণ ব্যবসা থেকে লাভ করে মোট ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ১১৭ পাউন্ড স্টার্লিং।[১৩]

কিন্তু ইংল্যান্ডের কর্মকর্তাদের প্রবল বিরোধিতার ফলে, ১৭৬৮ সালে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সঙ্ঘের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। এই বছরেই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে সঙ্ঘ ছাড়া দেশীয় ব্যবসায়ীদেরও লবণের ব্যবসায় অধিকার দেওয়া হয়। এই সুযোগে সঙ্ঘের ব্যবসায়ীরা ১৭৬৫-তে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা থেকে মাত্র ৬ বছরের মধ্যে, লবণের পুরনো মজুত বিক্রির অছিলায় চোরাপথে লবণের ব্যবসা করে সরকারকে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকার বেশি কর ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়।[১৪] এইভাবে এক দিকে বাংলার ঐতিহ্যশালী লবণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য মালঙ্গি ও দেশীয় ব্যবসায়ী ক্রমাগত শোষণের শিকার হতে থাকেন, অন্য দিকে কোম্পানির ছোট-বড় কর্মচারী সহ তাঁদের দেশীয় সহায়করা মুনাফার পাহাড় গড়তে থাকে।

যদিও কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে যাওয়ার পরে বাংলার লবণ শিল্পের কোনও উন্নতিই হয়নি, কারণ এই শিল্পটি ছিল কোম্পানির বিপুল রাজস্ব আদায়ের অন্যতম উপায় মাত্র। ফলত তার উন্নতির জন্য তারা কোনও তাগিদ অনুভব করেনি। পাশাপাশি বাংলা থেকে লুঠ করা অর্থের ভিত্তিতে ইংল্যান্ডে অন্য নানা শিল্পের মতো লবণ শিল্পও নতুনভাবে গড়ে ওঠে। এই কারণে দেশীয় লবণের চাহিদা ও বেচাকেনা ক্রমশ কমতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৮১৭ সাল থেকে ইংল্যান্ডের উন্নত যন্ত্রে তৈরি লবণ ভারতবর্ষে আসা শুরু হয়। এই লবণের দাম দেশীয় লবণের তুলনায় অনেক কম হওয়ার কারণে, অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম মেনে বিলিতি লবণ ধীরে ধীরে বাংলার লবণের বাজার অধিকার করে নেয়। এই অসম প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার জন্য, বাংলার বিভিন্ন স্থানের লবণের কারখানাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সারা বাংলায় প্রায় ৬ লক্ষ লবণ কারিগর রাতারাতি বেকার হয়ে শেষ পর্যন্ত ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকে পরিণত হতে বাধ্য হন।[১৫]

পলাশির পরে, ব্রিটিশদের সীমাহীন লোভের কারণে লবণ শিল্পের মতোই বাংলার সমৃদ্ধশালী বস্ত্রশিল্পও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮০০ সাল নাগাদ ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জন টেলর জানান, ১৭৪৭ সালে কেবল ঢাকা থেকে যে পরিমাণ বস্ত্র রফতানি হত, তার মোট মূল্য ছিল ২৮.৫ লক্ষ টাকা।[১৬] এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, মসলিন বা অন্যান্য মিহি সুতোর কাপড় ছাড়াও বাংলায় প্রচুর পরিমাণে খুব সাধারণ সস্তা মোটা কাপড়

বা মাঝারি মানের কাপড়ও তৈরি হত। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি আসার আগে এসব কাপড় শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নয়, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও প্রচুর পরিমাণে রফতানি হত। শুধু তাই নয়, এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বাংলায় ১০ লক্ষেরও বেশি তাঁতি বস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত ছিলেন।[১৭]

কিন্তু পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে বাংলা ও বিহারকে নির্বিচারে লুঠ করে কোম্পানি ও তার বশংবদ বণিকগোষ্ঠী যে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়, সেই অর্থই পরোক্ষে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে। এর আগে ইংল্যান্ডের শিল্প ক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হলেও ১৭৬০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পলাশির ৩ বছর পরেও, তার গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। কিন্তু বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদ ইংল্যান্ডে পৌঁছতে শুরু করার পর থেকে সেই গতি অতি দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। ১৭৬০ থেকে সেখানে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নানা ধরণের কলকারখানা তৈরি হতে থাকে এবং বস্ত্রশিল্পের মাধ্যমেই ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের শুরু হয়।

শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে ১৭৮২ সালে, ইংল্যান্ডের কাপড়কলের মালিকদের চাপে পড়ে কোম্পানি প্রথম ধাপে চার বছরের জন্য বাংলা থেকে বস্ত্র আমদানি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে এবং ভারতবর্ষ থেকে অতি অল্প মূল্যে বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করা শুরু করে। ওই বছরেই ইংল্যান্ডে ভারতীয় ছাপাই ক্যালিকো আমদানি করা বন্ধ হয়। ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ ১৭৮৩-তে ম্যাঞ্চেস্টারে মসলিন বস্ত্রের উৎপাদন শুরু হওয়ার পরে, ভারতবর্ষ থেকে মসলিন রফতানির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে।[১৮] ফলে এই সময় থেকে শুধু মসলিন নয়, ঢাকার বস্ত্রশিল্পের সামগ্রিক ক্ষেত্রেই অবক্ষয় শুরু হয়। ১৭৮৭-তে ইংল্যান্ডে কেবল ঢাকাই মসলিন রফতানির পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। অথচ ১৭৯৯ সালে ঢাকা থেকে ইউরোপে সমস্ত বস্ত্র রফতানির পরিমাণ কমে ১২.৫ লক্ষ টাকা হয়। ১৮১৩-তে তার পরিমাণ আরও কমে মাত্র ৩.৫ লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়ায় এবং ১৮১৭-তে মোট রফতানির পরিমাণ শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকে।[১৯]

ইতিমধ্যে ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকরণের সময়ে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের চাপে ইংল্যান্ডের সরকার ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার কেড়ে নেয় এবং কতগুলি শর্ত পালনের ভিত্তিতে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিদের ভারতে ব্যবসা করার অধিকার দেয়। স্বভাবতই ইংল্যান্ডে তৈরি সুলভ মূল্যের বস্ত্রের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতে তৈরি তাঁতবস্ত্র আত্মরক্ষা করতে অপারগ হয়। এর বিষময় ফল ভারতীয় বস্ত্রের বাজারে দেখা যায়। ১৮১৩ সালে কলকাতা যেখানে ইংল্যান্ডে ২০ লক্ষ স্টার্লিং মূল্যের সুতিবস্ত্র রফতানি করেছিল, সেখানে ১৮৩০ সালে কলকাতা ইংল্যান্ডে নির্মিত ২০ লক্ষ স্টার্লিং মূল্যের বস্ত্রসম্ভার আমদানি করে।[২০] আর এভাবেই একদা 'পৃথিবীর তাঁতঘর' নামে পরিচিত বাংলা, নিছকই ইংল্যান্ডের কলকারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বাজারে পরিণত হয়।

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা গ্রন্থের ভিত্তিতে বিশিষ্ট গবেষক ও ইতিহাসবিদ সুশীল চৌধুরী এ প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন, বস্ত্রশিল্পে অবক্ষয়ের ফলে বাংলায় অন্তত ১০ লক্ষ লোক কর্মহীন হয়ে পড়েন। তাঁর মতে, যদি ধরে নেওয়া যায় যে

এক একটি পরিবারের সদস্যসংখ্যা অন্তত ৬ জন (যা তখনকার দিনে খুব স্বাভাবিক), তাহলে বস্ত্রশিল্পের অবক্ষয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ৬০ লক্ষ জন।[২১] অন্য একটি গ্রন্থের সাহায্যে তিনি আরও দেখিয়েছেন, দেশীয় বস্ত্রশিল্পের এহেন পরিকল্পিত অবশিল্পায়নের ফলে তাঁতির চাইতেও সুতো কাটুনিরা, যাঁরা সকলেই মহিলা, বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইংল্যান্ড থেকে মেশিনে কাটা সস্তা সুতো আমদানির ফলে বাংলার সুতোর চাহিদা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে। তার ফলে অন্ততপক্ষে ২৫ লাখ মহিলা সুতো কাটুনি সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যান।[২২]

কোম্পানি ও তার কর্মচারীবৃন্দ রাজস্ব আদায়ের অছিলায় বাংলায় যে ব্যাপক লুঠতরাজ শুরু করে, সেই লুণ্ঠনযজ্ঞে লবণ ও বস্ত্রশিল্পের পরেই প্রধান স্থান অধিকার করে বাংলার আফিম ব্যবসা। মুঘল আমলে আফিম ব্যবসা থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ব্যবসায়ীদের তরফে অগ্রিম বার্ষিক অর্থ প্রদানের বিনিময়ে এক একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বাজারের একক নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেওয়া হত। যদিও ১৭৩৯ থেকে ১৭৫৭ সালের সময়কালে, এই ব্যবস্থা বাংলা ও বিহারে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পলাশির পরে, আফিম ব্যবসা ক্রমশ ব্রিটিশদের একচেটিয়া বাণিজ্যের আওতায় চলে আসে।

১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সরকারের পক্ষ থেকে আফিম চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন। কোম্পানির পরিচালকবর্গ হেস্টিংসকে আফিম ব্যবসা থেকে সরে আসার নির্দেশ দিলেও হেস্টিংস সেই নির্দেশ অমান্য করে আফিমের ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকেন। পরবর্তীকালে আর্থিক অনিয়মের দায়ে ইংল্যান্ডে যখন হেস্টিংসের বিচার শুরু হয়, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে হেস্টিংস আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন:

> কোম্পানি আমার শাসনকালে আফিম থেকে ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউন্ড রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।[২৩]

তাই আমরা দেখতে পাই, ১৭৭০ সালে যেখানে বার্ষিক গড় আফিম রফতানির পরিমাণ ছিল ৮০০ সিন্দুক (chest) বা ১৬০০ মণের সামান্য বেশি, সেখানে আঠারো শতকের শেষ দিকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার সিন্দুক বা প্রায় ৮ হাজার মণ। কেবল ১৭৯৩-৯৪ সালেই কোম্পানি আফিম থেকে লাভ করে ১৯ লক্ষ টাকা।[২৪]

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার বছর কয়েক পরে ১৭৮৬ সাল থেকে কোম্পানি ভারতবর্ষে সুতোয় পুঁজি বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। অন্য দিকে সে দেশে বস্ত্রশিল্পের বিকাশের জন্য, রঞ্জক পদার্থ হিসাবে নীলের চাহিদা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। এই কারণে কোম্পানির পরিচালকবর্গ এ দেশ থেকে সুতোর বদলে উৎকৃষ্ট মানের নীল আমদানির বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করে।[২৫] ১৭৯০-তে ইংল্যান্ডের মোট নীল আমদানির পরিমাণ ছিল ১৮,৪০,৮১৫ পাউন্ড। এর মধ্যে তারা সারা এশিয়া থেকে আমদানি করে মাত্র ৫,৩১,৬১৯ পাউন্ড। অথচ মাত্র ৫ বছর পরে ১৭৯৫ সালে, কেবল বাংলা থেকেই ২৯,৫৫,৮৬২ পাউন্ড নীল ইংল্যান্ডে রফতানি করা হয়।[২৬]

যদিও তাতে বাংলার নীলচাষিদের কোনও লাভই হয়নি। কারণ কোম্পানি ১ টাকা ৪ আনারও কম দামে প্রতি পাউন্ড নীল কিনত। অথচ লন্ডনের বাজারে তার বিক্রয়মূল্য ছিল, প্রতি পাউন্ড ৫ থেকে ৭ টাকা।[২৭] ১৭৯৫-৯৬ থেকে ১৮০৫-১৮০৬ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে

রফতানি করা নীলের মোট মূল্য ছিল ৪,৭৮,৫৭,৪০৯ সিক্কা টাকা বা ৯৭,৩২,১৭৬ পাউন্ড।[২৮] এই ক্রমবর্ধমান মুনাফার লোভেই বাংলার কৃষিজমিতে ধানের পরিবর্তে নীল চাষের জন্য কোম্পানির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলা ও বিহারের নানা জায়গায় অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপিত হয়। এই কুঠিগুলিতে যে নীল প্রস্তুত হত, তার প্রায় পুরোটাই কোম্পানি কিনে নিয়ে ইংল্যান্ডে পাঠাতে থাকে। এইভাবে লবণ, বস্ত্র ও আফিম ব্যবসার মতো নীলের ব্যবসাতেও কোম্পানি একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে।

এর ফলে বাংলার মানুষের কাছে দু-দিক থেকে বিপদ উপস্থিত হয়। এক দিকে, বেসরকারি বাণিজ্যে নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপনের দৌলতে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার গ্রামেগঞ্জে অভাবনীয় দৌরাত্ম্য শুরু করে। ফলত বাংলার কৃষক ও কারিগররা অত্যন্ত অল্প দামে তাঁদের উৎপাদন কোম্পানিকে বেচতে বাধ্য হন। অন্য দিকে, জায়গায় জায়গায় নতুন কুঠি গড়ে ওঠার কারণে স্বাধীন দেশীয় বণিকরাও সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে যান। প্রায় একই সময়ে বাংলা ও বিহারের কৃষকরা এক অভাবনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হন।

ভূমিরাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নীতিমালা নির্ধারণের জন্য, ১৭৭২-এ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর কাউন্সিলের চারজন সদস্যকে নিয়ে 'কমিটি অব সার্কিট' নামে এক অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ ১৭৭৩ সালে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হওয়া রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর ভিত্তিতে সৃষ্ট হয় গভর্নর জেনারেলের পদ। ওই বছরেই বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংস নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন। প্রথমে পাঁচসালা বন্দোবস্ত (১৭৭২-১৭৭৭) ও পরে তিন বছরের জন্য (১৭৭৮-১৭৮০) একসালা বন্দোবস্ত চালু হয়। অবশেষে একসালা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হলে, ১৭৮১ সালে হেস্টিংস স্থায়ী রাজস্বশাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ১৭৭৫ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক আঙিনায় নানা রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে বছরে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে উদ্যোগী হতে শুরু করে। বিশেষত ১৭৭৬-এ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে আমেরিকার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে, ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতিতে গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হয়। উপরি হিসাবে ১৭৮৯-এ ফরাসি বিপ্লব, ১৭৯৩-এ ফ্রান্সের যুদ্ধ এবং আঠারো শতকের শেষ দিকে নেপোলিয়নের আবির্ভাব ও বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষের কারণে ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটে। এমনকি ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষেত্রেও ১৭৭৫-এ মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ, ১৭৮০-তে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯০-এ তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে তারা আরও কোণঠাসা হতে শুরু করে। এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ দেশে অতি দ্রুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে।

অবশ্য এই বন্দোবস্ত চালু করার বিষয়ে সলতে পাকানোর কাজটি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়। ১৭৭০ সালে আলেকজান্ডার ডাও তাঁর 'The History of Hindostan' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে বাংলার শাসন-সংস্কারের একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সেখানে নিলাম ডেকে স্বল্পমেয়াদি ইজারায় জমি বন্দোবস্তের বদলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করে ডাও লেখেন:

> ...পার্লামেন্টে আইন পাশ করে অনূন বর্তমান রাজস্বের হারে বাংলা ও বিহারের সমস্ত জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা কোম্পানিকে দেওয়া হোক।[২৯]

এর বছর ছয়েক পরে, ১৭৭৬-এর ২২ জানুয়ারি ফিলিপ ফ্রান্সিস বাংলার গভর্নর ইন কাউন্সিলের কাছে এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করে জানান - জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি নয়, তা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং জমিদার রাষ্ট্রের কর্মচারী নন, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে এই সম্পত্তির মালিক। পাশাপাশি জমিদার-রায়ত সম্পর্কের প্রশ্নে তাঁর মূল যুক্তির জের টেনে তিনি বলেন:

> জমি জমিদারেরই উত্তরাধিকারগত সম্পত্তি। দেশের সংবিধান অনুযায়ী গভর্নমেন্টকে একটা রাজস্বভাগ দিয়ে জমিদার এই সম্পত্তি ভোগ করে। যতদিন সে এই শর্ত মেনে চলবে, ততদিন মালিকানা তারই এবং যাকে ইচ্ছা সে জমি ভাড়া দিতে পারে।[৩০]

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার ক্ষেত্রে ডাও বা ফ্রান্সিসের খোলাখুলি সমর্থনের পরেও কর্নওয়ালিস প্রথমেই সেই ব্যবস্থা চালু করতে পারেননি। তার পরিবর্তে ১৭৮৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, তিনি প্রথমে বাংলা ও বিহারে এবং পরের বছর উড়িষ্যায় দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, দশসালা বন্দোবস্ত চালু করার সময় জমিদারির সম্পদ অনুযায়ী রাজস্বের নতুন হার নির্ধারণ করার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, এমনকি কোম্পানির তরফে জমির পরিমাপ বা উৎপাদন-শক্তি হিসাব করার কোনও চেষ্টাও করা হয়নি। উপরন্তু কোম্পানির পরিচালকবর্গ বিগত ১০ বছরের রাজস্বের গড়কে দশসালা বন্দোবস্তের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কর্নওয়ালিস তা মানেননি। বরং তিনি কেবল পূর্ববর্তী বছরের (১৭৮৯-৯০) রাজস্বকে এই নতুন বন্দোবস্তের রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে ওই ভিত্তিবর্ষে যেসব জমিদারির রাজস্ব কম নির্ধারিত হয়েছিল, তাদের ভাগ্য খুলে যায় এবং যেসব জমিদার সে বছর রাজস্বভারে জর্জরিত ছিল, তাদের রাজস্ব চিরকালের জন্য তাই নির্ধারিত হয়ে যায়।[৩১]

রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে পাঁচসালা-একসালা-দশসালা ইত্যাদি নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার শেষে, কোম্পানির পরিচালক সভার অনুমোদনক্রমে ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ, কর্নওয়ালিসের দশসালা বন্দোবস্তই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে আইনগত স্বীকৃতি পায় এবং পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় চালু হয়। এই বন্দোবস্তে জমিদারদের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - ১. ধার্য রাজস্ব কিস্তিবন্দি অনুসারে নিয়মিত সিক্কা টাকায় শোধ করতে হবে; ২. খরা, বন্যা, মড়ক, লোকক্ষয় বা অন্য কোনও অজুহাতে রাজস্ব বাকি রাখা যাবে না; ৩. রাজস্বের জন্য নির্ধারিত জমি নিষ্কর জমি হিসেবে দান করা যাবে না এবং স্বীকৃত নিষ্কর জমিতে সরকারের অনুমতি ছাড়া কর আরোপ করা যাবে না; ৪. জমিদার তার জমিদারির অন্তর্গত যাবতীয় সেচব্যবস্থা নিজের খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করবে, না করলে সাজা পেতে হবে এবং ৫. উত্তরাধিকারীহীন কোনও জমিদার মারা গেলে তার জমি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে।[৩২]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বছরের শেষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে কোম্পানির আর্থিক ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সুবে বাংলায়

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার সময় কোম্পানির প্রাপ্য ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত হয় ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার পাউন্ড। মীরজাফরের রাজত্বকাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার মধ্যবর্তী প্রায় ৩০ বছরে রাজস্বের হার কী অবিশ্বাস্য পরিমাণে বেড়েছিল, তার উল্লেখ করে রমেশ দত্ত লেখেন:

> বাংলার শেষ মুসলমান শাসক তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে (১৭৬৪) ভূমি-রাজস্ব বাবদ ৮১৭,৫৫৩ পাউন্ড আদায় করেছিলেন। তিরিশ বছরের মধ্যে সেই প্রদেশ থেকেই ব্রিটিশ শাসকেরা ২,৬৮০,০০০ পাউন্ড খাজনা আদায় করে।[৩৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৭৬৫-৬৬-তে অর্থাৎ কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির প্রথম বছরে রেজা খাঁ-র আদায় করা রাজস্বের (১৪ লক্ষ ৭০ হাজার পাউন্ড) প্রায় দ্বিগুণ এবং মীরজাফরের শাসনের (১৭৬৪-৬৫) প্রথম বছরে মহারাজা নন্দকুমারের আদায়ীকৃত রাজস্বের (প্রায় ৮ লক্ষ ১৮ হাজার পাউন্ড) তিন গুণের সামান্য বেশি।[৩৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে প্রচলিত সামাজিক বিন্যাসও পাল্টাতে শুরু করে। পরবর্তীকালে জমিদারির মুনাফা বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও প্রথম দিকে অর্থাৎ লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়কালে, জমিদারদের ওপর দেয় রাজস্বের যে ভার চাপানো হয়, তৎকালীন অবস্থায় তা যে যথেষ্ট বেশি ছিল- সে প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। বিশেষত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে অনেক দিন পর্যন্ত কৃষকদের খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা আগের থেকে কমে আসে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে জমিদারদের পক্ষে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এই রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হত না। এই অবস্থায় অনেক জমিদার জমিদারি রক্ষার জন্য মহাজন, দেওয়ান, বেনিয়ান কিংবা জমিদারদের অধস্তন কর্মচারীদের শরণাপন্ন হতেন। কিন্তু এত সব করেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত জমিদারি রক্ষা করতে পারতেন না। বন্দোবস্তের শর্ত অনুসারে সরকারের হাতে দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দিতে না পারার কারণে, ১৭৯৩-৯৪ থেকে ১৮০৬-০৭ সালের মধ্যে বাংলা ও বিহারের মোট জমিদারি সম্পত্তির প্রায় ৪১ শতাংশ নিলামে বিক্রি হয়।[৩৫] আর সেসব জমি নিলামে কিনে নিতে থাকে কোম্পানির আর্থিক শোষণের একনিষ্ঠ সহযোগী কিছু দেওয়ান, বেনিয়ান, সরকার, মুনশি ও খাজাঞ্চি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ।

ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার কারণে, মুঘল যুগের বণিকরা ধীরে ধীরে বাংলার অর্থনৈতিক মানচিত্র থেকে ক্রমশ সরে যেতে থাকেন। তার আগেই বাংলার মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপসারিত হওয়ার ফলে, মুঘল প্রশাসনের কর্মীরাও অন্তর্হিত হয়ে যান। তাঁদের শূন্যস্থান দখল করে নেয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট এই নতুন অভিজাত বাঙালি শ্রেণির প্রতিনিধি দেওয়ান, বেনিয়ান, গোমস্তা, মুনশি ও দালালরা। তারা ও তাদের বংশধররা সকলেই জমিদারি কিনে নতুন জমিদার হয়। যেমন গর্ভনর জেনারেল হেস্টিংসের প্রধান মুৎসুদ্দি তথা মুর্শিদাবাদের কান্দি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সারা বাংলায়, এমনকি বাংলার বাইরেও জমিদারি কিনতে শুরু করেন। কলকাতা রেভিনিউ কমিটির এই দেওয়ান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে যে জমিদারির মালিক হন, তার বাৎসরিক সরকারি রাজস্ব ছিল ৫ লক্ষ টাকা। অন্য দিকে, হেস্টিংসের বেনিয়ান তথা কাশিমবাজারের রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে যে জমিদারি স্থাপন করেন, তার দেয়

রাজস্বের বার্ষিক পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। আবার হুগলি জেলার তেলিনীপাড়া পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি ও তাঁর ভাই রামলোচন ব্যানার্জি যথাক্রমে বর্ধমান ও নদীয়া মহারাজার কর্মচারী ছিলেন। তাঁরা নদীয়া জমিদারির ১১টি পরগনা মোট ৭ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন। অনুরূপভাবে, রাজশাহী জমিদারির গোমস্তা কালিশঙ্কর রায় রাতারাতি ৮ লক্ষ টাকার বিনিময়ে যশোহরের নড়াইলে যে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন, তার জন্য তিনি সরকারকে বছরে ২ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন।[৩৬]

সময়মতো নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারকে দিতে হবে, এই বন্দোবস্ত অনুসারে এটুকুই ছিল জমিদারদের একমাত্র দায় ও দায়িত্ব। ফলে প্রজাদের থেকে আইনি খাজনা আদায়ের পরেও বিভিন্ন ধরণের 'আবওয়াব' ও অন্যান্য কর আরোপ করে বেআইনিভাবে খুশিমতো খাজনা আদায় করা হত এবং সেই উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে পৌঁছনোর পরিবর্তে তাদের নিজস্ব তহবিলে জমা হত। এই জমিদাররা কৃষকদের অমানবিক শোষণ করে কীভাবে অমিত ধনসম্পদের মালিক হয়ে ওঠে, তা মাত্র তিনটি উদাহরণেই স্পষ্ট হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে, বাংলার সমস্ত জমিদারির এক-তৃতীয়াংশ ৯টি বিখ্যাত জমিদার পরিবারের দখলে ছিল, যথা- বর্ধমানের মহারাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা, প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, ব্রজেন্দ্র কিশোর, নাটোরের জমিদার, ময়মনসিংহের মহারাজা, নসিপুর, দীঘাপাতিয়া ও পুঠিয়ার জমিদার। এই ৯টি পরিবার সরকারকে রাজস্ব বাবদ দিত বছরে ১ কোটি টাকা, অথচ বাংলার একজন চাষির গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র ৪৩ টাকা।[৩৭] আর একটি সূত্র থেকে জানা যায়, বাংলার জমিদাররা প্রতি একরে সরকারকে খাজনা দিত ১০ আনা ৮ পয়সা। অথচ বেআইনি আদায় বাদ দিয়ে তারা কৃষকদের থেকে আদায় করত একর প্রতি ৩ টাকা অর্থাৎ সরকারকে দেয় রাজস্বের প্রায় পাঁচগুণ।[৩৮] আবার ১৮৩০ সালে ময়মনসিংহ জেলায় কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হয় ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৩২ টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব হিসেবে সরকারকে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৪১ টাকা দেওয়ার পরেও জমিদারদের তহবিলে উদ্বৃত্ত থেকে যায় ২ লক্ষ ৭৯১ টাকা।[৩৯]

কোম্পানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন যে নতুন জমিদারশ্রেণি সৃষ্টি করা হয়, সেই শহরবাসী নতুন জমিদারদের বল্গাহীন কৃষকশোষণের জন্য কোম্পানি একের পর এক উৎপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করতে থাকে। টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের আর্থিক চাপ সামলানোর জন্য, ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলি কুখ্যাত 'হফ্তম' (সপ্তম) আইন জারি করে জমিদারদের হাতে আরও ক্ষমতা তুলে দেন। এরপর ১৮১২-তে লর্ড মিন্টোর জারি করা 'পঞ্চম' আইনের মাধ্যমে জমিদার-রায়ত সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন আনা হয়।

জমিদারিতে উপস্থিত না থেকেও জমিদারির রক্ষণাবেক্ষণ ও যথাসময়ে খাজনা আদায়ের প্রয়োজনে এই অলস অকর্মণ্য বিলাসপ্রিয় নব্য জমিদারশ্রেণি এক নতুন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির সৃষ্টি করে। এই পত্তনিদার, দরপত্তনিদাররা রাতারাতি ধনী হওয়ার লোভে কৃষকদের ওপর লাগামছাড়া শোষণ চালাতে থাকে। ক্রমশ শক্তি ও সম্পদ সঞ্চয় করে এক সময় তারা ক্ষুদে জমিদারশ্রেণিতে পরিণত হয়। আসলে কোম্পানির শাসকরা এ কথা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, এক সুবিশাল জনসমষ্টির ওপরে মুষ্টিমেয়

ব্রিটিশদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে হলে ভারতীয় সমাজের মধ্য থেকেই এমন এক নতুন শ্রেণি সৃষ্টি করতে হবে, লুঠের মালের অংশীদার হয়ে যাদের স্বার্থ ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখার ব্যাপারে ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যাবে। সুতরাং তারা এক দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নতুন জমিদারশ্রেণি সৃষ্টি করে, অন্য দিকে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে ১৮১৯ সালের 'অষ্টম' আইন জারি করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত এই নতুন বংশানুক্রমিক মধ্যস্বত্বাধিকারীদের আইনগত স্বীকৃতি দেয়।

ব্রিটিশদের নিজেদের স্বার্থে সৃষ্ট এই জমিদার ও মধ্যসত্বভোগী শ্রেণির প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লেখেন:

> ১৮৭২-৭৩ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে দেখা যায় যে মধ্যস্বত্বের বিস্তারের ফলে জমিদারীর সংখ্যা বাংলাদেশে দেড় লক্ষের বেশি হয়েছে, বিশ হাজার একরের উপরে বড় জমিদারীর সংখ্যা পাঁচশ'র কিছু বেশি, বিশ হাজার থেকে পাঁচশ একরের মধ্যে মাঝারি জমিদারী প্রায় ষোল হাজার, এবং পাঁচশ একর ও তার কম ছোট জমিদারীর সংখ্যা দেড় লক্ষের কিছু কম। এর সঙ্গে যদি জমিদার-পত্তনিদার-জোতদারদের গোমস্তা নায়েব তহশীলদার পাইক দফাদার প্রভৃতি কর্মচারী ও ভৃত্যদের সংখ্যা যোগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে উনিশ শতকের শেষ পর্বে ব্রিটিশ ভূমিরাজস্বনীতির ফলে বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজে কমপক্ষে সাত-আট লক্ষ লোকের এমন একটি 'শ্রেণী' (সামাজিক 'স্তরায়ন') তৈরি হয়েছে, যে শ্রেণী ব্রিটিশ শাসকদের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ।[৪০]

এর পরিণতিস্বরূপ, মধ্যস্বত্বভোগীরা জমিদারদের মোট প্রাপ্যের ওপর নিজেদের অতিরিক্ত প্রাপ্য কৃষকদের থেকে আদায় করতে শুরু করে। আর জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের যৌথ শোষণের ফলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেন।

তথ্যসূত্র:

১. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলার ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃ. ২৯৭-৯৮

২. N. K. Sinha, The Economic History of Bengal: From Plassey to the Permanent Settlement, Vol. II, Calcutta, 1960, p. 49

৩. Romesh Dutt, The Economic History of India under Early British Rule, London, Second Edition, 1906, pp. 32-33

৪. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৯

৫. সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস :ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩০

৬. N. K. Sinha, The Economic History of Bengal: From Plassey to the Permanent Settlement, Vol. I, Calcutta, Third Edition, 1965, p. 12

৭. Amiya Kumar Bagchi, Colonialism and Indian Economy, New Delhi, 2010, p. xxviii

৮. Romesh Dutt, The Economic History of India under Early British Rule, p. 23

৯. তদেব, পৃ. ৩৭

১০. প্রমথনাথ মল্লিক, কলিকাতার কথা, আদিকাণ্ড, কলকাতা, ১৯৩১, পৃ. ১৯৭

১১. William Bolts, Considerations of Indian Affairs, London, 1772, p. 174

১২. N. K. Sinha, The Economic History of Bengal, Vol. I, p. 216

১৩. তদেব, পৃ. ৮৩

১৪. তদেব, পৃ. ৮৩-৮৪

১৫. N. K. Sinha (ed.), Midnapore Salt Papers: Hijli and Tamluk (1781-1807), p. 146; উদ্ধৃত সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ. ১৯৩

১৬. সুশীল চৌধুরী, পৃথিবীর তাঁতঘর : বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ১৬০০-১৮০০, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১১৯

১৭. Radhakamal Mukerjee, The Economic History of India: 1600-1800, Calcutta, Year not mentioned, p. 148

১৮. Asok Sen, 'The Bengal Economy and Rammohun Roy'; V. C. Joshi (ed.), Rammohun Roy and the Process of Modernization in India, Delhi, 1975, pp. 123-24

১৯. জেমস টেলর, কোম্পানি আমলে ঢাকা, অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২০৮

২০. Romesh Dutt, The Economic History of India under Early British Rule, p. 293

২১. D. B. Mitra, The Cotton Weavers of Bengal, Calcutta, 1978, p. 210; উদ্ধৃত সুশীল চৌধুরী, পৃথিবীর তাঁতঘর, পৃ. ১৭০

২২. H. R. Ghosal, Economic Transition in the Bengal Presidency, 1793-1833, Patna, 1950, p. 44; উদ্ধৃত তদেব

২৩. N. K. Sinha, The Economic History of Bengal, Vol. I, p. 202

২৪. তদেব, পৃ. ২০৪

২৫. তদেব, পৃ. ২৯

২৬. Reports and Documents connected with the Proceedings of the East India Company in regard to the Culture and Manufacture of Cotton, Raw Silk and Indigo in India, London, 1836, pp. 27, 42, 50; উদ্ধৃত প্রমোদ সেনগুপ্ত, নীল-বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৬-৭

২৭. তদেব, পৃ. ৮-৯

২৮. John Phipps, A Guide to the Commerce of Bengal, Calcutta, 1823, p. 281; উদ্ধৃত Amalendu De, Indigo Plantation in Bengal, Calcutta, 2013, p. 133

২৯. 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত'; রণজিৎ গুহ, রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৪১

৩০. তদেব, পৃ. ৬৪

৩১. সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস :ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃ. ১৩৫

৩২. তদেব, পৃ. ১২০

৩৩. Romesh Dutt, The Economic History of India under Early British Rule, p. ix

৩৪. তদেব, পৃ. ৮৫, ৯২-৯৩

৩৫. ইরফান হাবিব, ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে ভারতের অর্থনীতি ১৭৫৭-১৮৫৭, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৩৭

৩৬. সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস :ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃ. ১৬৯-৭০

৩৭. ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, কলকাতা, ১৯৪৬, পৃ. ১১-১২; উদ্ধৃত অমলেন্দু দে, বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ , কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৭৩

৩৮. Memorandum on the Permanent Settlement presented by the Bengal Provincial Kisan Sava to the Land Revenue Commission, p. 51; উদ্ধৃত বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৬

৩৯. পুলক চন্দ, নীল বিদ্রোহ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫-১৬

৪০. বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ১৫২-৫৩

দেবোত্তম চক্রবর্তী

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ১৭৫৭-১৮৩৭

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয় (১৭৫৭) থেকে রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের বছর (১৮৩৭) পর্যন্ত নানা ঘটনা বিবৃত করেছেন। তার এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি নিম্নরূপ।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬১ পর্যন্ত বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উইলিয়ম পিট। এই পাঁচ বছরের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড এই ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে ১৮৩৭ সালে। এ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই আশি বছরে (১৭৫৭-১৮৩৭) তিন প্রজন্মের বৃটিশ শাসকেরা ভারত শাসন করেছেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। প্রথম যুগ ছিল ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের যুগ - অর্থাৎ একটি সওদাগরী কোম্পানির রাজতক্তে বসবার যুগ। দ্বিতীয় যুগ ছিল মহীশূর ও মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ভারতে বৃটিশ-শাসন নিষ্কণ্টক করার যুগ। অর্থাৎ কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেসলী ও লর্ড হেস্টিংসের যুগ। তৃতীয় যুগ হলো বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্ত ভিতের উপরে গড়ে তোলবার যুগ। অর্থাৎ মুনরো, এলফিনস্টোন ও বেন্টিঙ্কের যুগ। (প্রথম অধ্যায়)

অষ্টাদশ শতকে ভারতে স্থল বা নদীপথে বাণিজ্য শুল্ক স্থল-শুল্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাদশাহের সনদ বলে নিঃশুল্ক ব্যবসায় করতো। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পরে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তো বটেই, ব্যক্তিগত ভাবে কোম্পানির কর্মচারীরাও সে সুযোগ গ্রহণ করেন। কোম্পানির কর্মচারীরা নবাবের শাসন অগ্রাহ্য করতো। মীরকাশিম দেশী ব্যবসায়ীদের স্থল-শুল্কও রদ করে দেন। বৃটিশ কর্মচারীদের জবরদস্তি, শোষণ ও লুণ্ঠনের মৃগয়া রক্ষার জন্য মীরকাশিমের বিরুদ্ধে কোম্পানি যুদ্ধে নেমে পড়ে। এবং মীরকাশিমকে পরাস্ত করে পুনরায় মীরজাফরকে তারা নবাবী মসনদে বসায়। মীরজাফর, মীরকাশিম, পুনরায় মীরজাফরকে গদিতে বসানোর জন্য কোম্পানি তো বটেই কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরাও প্রতিদানে প্রচুর অর্থ উপঢৌকন পায়। (১৭৫৭-৬৫, দ্বিতীয় অধ্যায়)

১৭৬৫ সালে কোম্পানি বঙ্গদেশের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের বাদশাহের কাছ থেকে দেওয়ানী পদটি লাভ করলেন। শুরু হলো দ্বৈত শাসন। কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারী, নবাব প্রশাসনের। তার উপরে যুক্ত হল ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির কর্মচারীদের নিষিদ্ধ ব্যবসায়- যে ব্যবসা আসলে জোর করে কারিগরদের দিয়ে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিয়ে নিয়ে একচেটিয়াভাবে বিপণনের অধিকার মাত্র। ফলে দেশে উৎপীড়ন বেড়ে চলল। ইংরেজ কোম্পানির দেশী-বিদেশী কর্মচারীদের রাজস্ব সংগ্রহের অত্যাচার, এবং হঠাৎ বড়লোক হবার ঝোঁক দেশবাসীদের উপর প্রবল উৎপীড়ন চাপিয়ে দেয়! এ-সবের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১৭৬৯-এ দেখা দিল।

বৃটিশ কোম্পানি এ-দেশে উপার্জিত অর্থে এ-দেশে মাল কিনে ইয়োরোপে বিক্রী করতো, চীনে বাণিজ্য করতো।। এইভাবে মাল কেনার নাম ছিল 'লগ্নী'। শুরু হলো সম্পদের নিকাশ। (১৭৬৫-৭২, তৃতীয় অধ্যায়)

বৃটিশ আধিপত্যের আগে 'রাষ্ট্র ছিল রাজস্ব পাবার অধিকারী : জমিদাররা ছিলেন প্রথাগত খাজনা পাবার অধিকারী, রাষ্ট্রকে তারা একটা রাজস্ব দিতেন, জমিদারদের প্রথাগত খাজনাপ্রদান সাপেক্ষে রায়তদের ছিল তাদের জোতের উপর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার। কিন্তু দ্রুত ভূমি রাজস্ব লুণ্ঠন করে ফুলে ফেঁপে ওঠার তাগিদে কোম্পানি প্রথমে ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য এক জমি বন্দোবস্ত করে (১৭৭২)। নিলামে তুলে দেওয়া হলো জমিদারী। যে যত বেশী দর দিতো সেই হতো চাষীর কাছে খাজনা পাবার ইদারাদার। ফলে 'প্রাচীন ভূস্বামী পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়, চাষীরা মর্মান্তিকভাবে নিপীড়িত হতে থাকে'। এরপর এলো বার্ষিক বন্দোবস্ত। দেশ আর্থনীতিক নিপীড়নে আর্তনাদ করতে থাকে।

এ সময়েই জেলায় জেলায়, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত বসানো হয়। কলকাতায় গঠিত হয় উচ্চতর আদালত-পুলিশি ব্যবস্থার রদবদল করা হয়। ১৭৮১ সালে দেওয়ানী জজদের ও কালেক্টরদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হল। ছলচাতুরি ও জবরদস্তির সহায়তা নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস অযোধ্যা ও বারাণসী গ্রাস করলেন। দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অবশ্য তিনি কিছু কিছু প্রশাসনিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। (১৭৭৫-৭৮, চতুর্থ অধ্যায়)

কর্ণওয়ালিসের সময় নবাবের হাত থেকে ফৌজদারী বিভাগ কোম্পানি নিয়ে নেয়। ১৭৭৬ সালেই ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের সুপারিশ করেন। তা কার্যকরী করলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। এবং 'অনিশ্চিত ও ক্রমবর্ধমান এক রাষ্ট্রীয় চাহিদার দ্বারা জনগণকে পঙ্গু করার পরিবর্তে জনগণকে তাদের নিজেদের শ্রমের দ্বারা লাভবান হতে দেওয়ার জন্য এই কাজটি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। অবশ্য ভূমিকর যথাসম্ভব কঠোর করা হয়েছিল'। এই ভূমিকর নির্ধারিত হয়েছিল খাজনার ৯০ শতাংশ হারে। (১৭৮৫-৯৩, পঞ্চম অধ্যায়)

ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে বিশ বৎসর যাবৎ যুদ্ধের ১৭৬৩ সালে পরিসমাপ্তির পর দেখা গেল দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের অধিকারই পুরো দস্তুর বজায় আছে ও শক্তিশালী হয়েছে। ইংরেজরা মহম্মদ আলীকে কর্ণাটকের নবাব বানালো। এই অপদার্থ নবাবের সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইংরেজরা বেশ মোটা টাকা পেত। কর্ণাটকের চাষীর সম্পদ একে একে চলে গেল ইংরেজ পাওনাদারদের হাতে। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন ইংরেজ বিপুল সম্পত্তির কার্যত মালিক হয়ে বসে। তাঞ্জোর রাজ্য ঐ নবাবের অধীনে চলে যাবার পর সেখানেও চললো নবাবের লুণ্ঠন ইংরেজ পাওনাদারদের তুষ্ট করার জন্য। সমৃদ্ধিশালী তাঞ্জোর হয়ে গেল উষর। এর সঙ্গে যুক্ত হলো হায়দার আলীর আক্রমণ। ১৭৮৩ সালে এ-সবের ফলে মাদ্রাজে দেখা দিল চরম দুর্ভিক্ষ। এ-দেশে লুণ্ঠনের টাকায় বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি প্রভাবশালী অংশ সৃষ্টি হল। অবৈধ ও জাল ঋণের দায়ে দেশ সম্পদ শূন্য হল। (১৭৬৩-৮৫, ষষ্ঠ অধ্যায়)

'উত্তর সরকার' অঞ্চলে ছিল জমিদারী ও খাস (হাবেলি) জমি। গ্রাম পরিচালনায় এতদিন ছিল গ্রামসমাজ। প্রথমে ১৭৭৮-এর আগে এ অঞ্চলে বাৎসরিক বন্দোবস্তে জমি জমিদারদের দেওয়া হতো। তারপর ১৭৭৮ থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদে। ১৭৮৮ থেকে গুন্টুরেও একই নিয়ম চালু হলো । ১৮০২ থেকে ১৮০৪ এ এতদঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়। ১৭৯২ সালে শ্রীরঙ্গপত্তনমের সন্ধি মারফত বড়মহলের অন্তর্গত সালেম ও কৃষ্ণগিরি কোম্পানির অধিকারে আসে। ১৭৯৯ সালে এলো কানাড়া, কোয়েম্বাটুর, বালাঘাট ও আরও কয়েকটি অঞ্চল।

১৭৯৯-এ তাঞ্জোর এবং ১৮০০ সালে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা'র মধ্যবর্তী অঞ্চল ইংরেজের অধিকারে আসে। আর্কটও দখল হয়। এ-ভাবে ১৭৯২ থেকে ১৮০২-এর মধ্যে বিপুল অঞ্চল কোম্পানির শাসনের আওতায় আসে। এই সব অঞ্চল নিয়েই গড়ে ওঠে মাদ্রাজ প্রদেশ। মাদ্রাজ অঞ্চলে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেন লর্ড টমাস মুনরো। 'রায়তোয়ারি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল খাজনার আকারে জমি যতটা উৎপাদন করতে পারে সরকারের জন্য তা আদায় করা'। (১৭৮৫-১৮০৭, সপ্তম অধ্যায়)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বনাম রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত নিয়ে মাদ্রাজে বিতর্ক দেখা দেয়। মুনরোও ১৮০৭ সালে দেশে ফেরার সময় স্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষেই মত দিয়ে যান। ১৮১৪-এ তিনি ভারতে আসেন। ১৮১৯-এ আবার দেশে ফিরে যান। তৃতীয়বার তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন গ্রাম-সমাজ ভিত্তিক বন্দোবস্তও চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে রায়তোয়ারি বন্দোবস্তে রাজস্ব স্থায়ী করার জন্য সুপারিশ করা সত্বেও ১৮৬২ পর্যন্ত এই স্থায়িত্বের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়। (১৮০৭-২০, অষ্টম অধ্যায়)

স্যর টমাস মুনরো শেষবারের মতো ভারতে আসেন ১৮২০ সালে, মাদ্রাজের গভর্ণর হয়ে। তখন বকেয়া উপলক্ষে, বা ক্রয়ের সাহায্যে জমিদারী ও মুটাগুলি, এবং অন্য যে সমস্ত দখলী স্বত্বে রায়তোয়ারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে সেগুলিকে ফিরে পাওয়ার সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করা হয় এবং গ্রামের ইজারা দ্রুত পরিত্যাগ করা হয়। কালেক্টরদের প্রজাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে উৎসাহ দেওয়া হয়। করের পরিমাণ কিছুটা লাঘবও করা হয়। নেলোর, ত্রিচিনোপল্লী, কোয়েম্বাটুর, তাঞ্জোর, আরকট প্রভৃতি স্থানের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় মুনরোর কর-হ্রাসের নীতির আগে সে অঞ্চলে ছিল অতিমাত্রায় ভূমিরাজস্বের কায়দায় শোষণ। মুনরোর মতে, খাস জমি বাদে জমির প্রকৃত মালিক রায়তই। প্রশাসনিক কাজে ভারতীয়দের নিয়োগ তিনি নীতিগত কারণে ও রাজনীতিগত কারণে সুপারিশ করেন। কর আরোপ ও আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও 'দেশীয় কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এমন-কি তিনি এ-দেশে ভূমিসত্ত্বভোগী একটি অবস্থাপন্ন শ্রেণী উদ্ভবের পক্ষে যুক্তি দেখান। (১৮২০-২৭ নবম অধ্যায়)

১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল, কর্ণওয়ালিস ও শোর বারানসী পর্যন্ত তার বিস্তার চেয়েছিলেন। ১৭৯৪ সালে বারাণসীর রাজা বিরাট অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত করেন। ১৭৯৫ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ছ বছর পরে অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদসহ অন্য জেলাগুলোকে ইংরেজের হাতে তুলে দেন। ভয় দেখিয়ে ওয়েলেসলী এ-সব জেলা গ্রাস করলেন। ১৮০৩

সালে লাসওয়ারীর যুদ্ধে মারাঠাদের হারিয়ে ইংরেজরা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করে। অযোধ্যার নবাবের কাছে ছিনিয়ে নেওয়া হস্তান্তরিত জেলাগুলি এবং এই বিজিত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হলো ১৮০৩-এ বুন্দেলখণ্ড ও কটক। ভূমি-রাজস্ব তুলে নেওয়া হল বিপুল পরিমাণ বাৎসরিক, ত্রৈবার্ষিক ও চতুর্বার্ষিক বন্দোবস্তের কায়দায়। ঐ সব অঞ্চলে রায়তদের সামনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের টোপ ফেলেও শেষ পর্যন্ত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তা স্থায়ী করল না। (১৭৯৫-১৮১৫, দশম অধ্যায়)

গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের-এর কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার জন্য চূড়ান্ত আবেদন করেন। তা নাকচ করে দেওয়া হয়। বোর্ডের তৎকালীন সেক্রেটারি হোল্ট ম্যাকেঞ্জি ১৮১৯ সালের বিখ্যাত মিনিটে উত্তর-ভারতে গ্রামসমাজের অস্তিত্বের কথা বলেন। ১৮২১ সালে ম্যাকেঞ্জির মিনিটকে ভিত্তি করে ভাবা হয় যে, যেখানে জমিদার আছে সেখানে তার সঙ্গে, আর যেখানে গ্রামসমাজ আছে সেখানে গ্রামের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হবে। 'একটি একটি করে বিভিন্নগ্রামে ও ভূ-সম্পত্তির এলাকায় এবং ভারতীয় ভাষায় ভূ-সম্পত্তির এলাকাকে যেহেতু 'মহল' বলে, সেই জন্য উত্তর তারতে যে-বন্দোবস্ত হয়, তা মহলওয়ারি বন্দোবস্ত নামে পরিচিত'। এ বন্দোবস্তও চিরস্থায়ী হল না। ১৮৩৩-এ বেন্টিঙ্ক এ ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ রদবদল ঘটান। (১৮১৫-২২, একাদশ অধ্যায়)

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮০০ সালে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী জনসাধারণের অবস্থা এবং তাদের কৃষি ও পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে অর্থনৈতিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণভারত ভ্রমণের জন্য মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানানকে নির্দেশ দেন। ডাঃ বুকানান মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে ভ্রমণ শুরু করে কর্ণাটক, মহীশুর, কোয়েম্বাটুর, মালাবার ও কানাড়া পর্যন্ত যান। তাঁর রোজনামচাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সমস্ত জায়গায় চরম দারিদ্র্য দেখেছিলেন। 'ভূমি-রাজস্বের অত্যধিক চাপ, স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজ থেকে সরকারের সরে আসা এবং ঘনঘন যুদ্ধবিগ্রহের ফলে প্রবল দারিদ্র্য বিরাজ করছিল একদা সম্পদশালিনী দক্ষিণভারতের এ অঞ্চলগুলিতে। (১৮০০, দ্বাদশ অধ্যায়)

ডাঃ বুকানান সাত বছর (১৮০৮-১৮১৫) ধরে বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতের জেলাগুলি ভ্রমণ করেন। পাটনা শহর ও বিহার জেলা ভ্রমণ করার সময় তিনি ধানকেই উল্লেখযোগ্য ফসল হিসেবে দেখেছিলেন। গম-যব ছাড়া সমস্ত প্রকার ডাল ও অন্যান্য আআকসব্জি উৎপন্ন হতো। আলু-আখ-তামাক-পান-নীল ও কুসুমের চাষ ছিল। জমির মালিক খাজনা পেত খরচ-খরচার উপরে উদ্বৃত্তের অর্ধেক। কিন্তু জমির সেচব্যবস্থা জমিদারদেরই দেখতে হতো। সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন ছিল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্প। তাছাড়া ছিল কাগজ উৎপাদন, চামড়ার কাজ, লৌহদ্রব্য, সোনা ও রূপার কাজ, পাথর, মৃৎপাত্র, রাজমিস্ত্রীর কাজ, চুন উৎপাদন, কাপড় রাঙানো, কম্বল তৈরী, সোনা ও রূপার, জরির কাজ ইত্যাদি। বাণিজ্য চালাতো বলদিয়া ব্যাপারিরা। পাটনা থেকে মাল চালান যেত কলকাতায় নৌকায়। সাহাবাদ জেলায় ধান উৎপাদন হতো বেশী। তাছাড়া ছিল তাঁতের কাজ। জমিদারদের ঘাড়ে রাজস্বের চাপ ছিল অত্যন্ত বেশী রকম। কাগজ, গন্ধদ্রব্য, তেল, লবণ, মদ তৈরী হতো সাহাবাদে। আতিথেয়তা লক্ষণীয়ভাবে ছিল। ভাগলপুর জেলায় শস্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান। অন্যান্য চাষও ছিল। তাছাড়া হত তুলোর চাষ। সেচব্যবস্থা পরিচালনা করতো জমিদারেরা,

খাজনা ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ। সুতো কাটা ছিল ব্যাপকভাবে। সুতোকাটুনির সংখ্যাও ছিল অনেক। বেলোয়ারি চুড়ি, চামড়া পাকা করার কাজ, লোহার কাজ প্রভৃতি নানা ধরনের শিল্পকর্ম ছিল। এখানেও বলদিয়া ব্যাপারিরাই মুখ্যত সওদাগর ছিল। গোরক্ষপুর জেলায় গম ছিল উল্লেখযোগ্য শস্য। তা ছাড়া ছিল নানা শুঁটিজাতীয় কৃষি উৎপাদন। সেচের ব্যবস্থা ছিল। বুকাননের মতে সুজা-উদ-দৌলার শাসন কালে এ-জেলার অবস্থা আরো ভালো ছিল। সুতোর কাজ এ অঞ্চলে ছিল বেশী পরিমাণে। অন্যান্য আবশ্যিক শিল্পকর্মও ছিল। টাকার ব্যবহারও চালু ছিল। দিনাজপুর জেলায় ধানই ছিল মুখ্য শস্য। গ্রীষ্মকালীন ফলের বাগিচা ছিল। পাট, তুলো, আখ উৎপন্ন হতো। নীল ও লোধ্রের চাষ ছিল। রেশমকীটের চাষও ছিল। সেচের ব্যবস্থা ছিল না। সুতোকাটাই ছিল প্রধানতম শিল্পোৎপাদন। মালদাই বস্ত্র ও পাটের বস্ত্র তৈরি হতো। চিকনের কাজ করতো মালদহের মুসলিম মহিলারা। রং-এর ব্যাপক রপ্তানি ছিল। ইংরেজ প্লান্টারদের অত্যাচার ছিল অপরিসীম। বাণিজ্যের অধিকাংশটাই চলে গিয়েছিল বিদেশীদের হাতে। পুর্ণিয়ায় ধান, পাট প্রভৃতির চাষ ছিল। নীলের কারখানা ছিল অনেকগুলি। রেশমের বস্ত্রও তৈরী হতো। সতরঞ্জি ও ফিতাও বোনা হতো। হিসেব নিকাশ করে দেখা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাক্ষিণ্যে এতদঞ্চলে দক্ষিণের অঞ্চলগুলির মতো উৎপীড়ন-মুলক চাপ এসে পড়েনি। ফলে পতিত জমির উন্নতি ও পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। তবে খারাপ অবস্থার দিকে চলে যায় এসব অঞ্চলের শিল্প ও কারবার। (১৮০৮-১৫, ত্রয়োদশ অধ্যায়)

ইংরেজকুঠি রেশমের একচেটিয়া উৎপাদনের অধিকারী হয়ে পড়ে বলে দেশী কারবার গুটিয়ে যেতে থাকে। ফলে রপ্তানিকারী দেশ ভারত হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে আমদানিকারী। আসলে লক্ষ্য ছিল কীভাবে ইয়োরোপীয় শিল্প সামগ্রী ভারতীয় শিল্প সামগ্রীর স্থানে প্রতিস্থাপন করা যায়, এবং কি ভাবেই বা ভারতীয় শিল্পের বিরুদ্ধাচরণ করে বৃটিশ শিল্পসমূহের উন্নতিবিধান করা যায়। (১৭৯৩-১৮১৩, চতুর্দশ অধ্যায়)

ভারতীয় শিল্পবিকাশের জন্য কোনো প্রচেষ্টা হয়নি। একদিকে অসম প্রতিযোগিতা, অন্য দিকে নানা ধরনের চাপ শিল্পগুলিকে গুঁড়িয়ে দিতে থাকে। ক্রমশ প্রশ্ন উঠতে থাকে ভারতে বাণিজ্যের অধিকার কেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরই একচেটিয়া থাকবে কিনা। এক কথায় ভারতীয় শিল্পগুলির বিলুপ্তিই তখন বৃটিশ পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়েছে। আর এ-দেশে গড়েও উঠছিল একটি শ্রেণী যাদের 'ইংরেজী বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হবার একটা লক্ষণীয় প্রবণতা দেখা গেছে; তাদের সুসজ্জিত গৃহ আছে, অনেকেই ঘড়ি পরে, তারা গাড়ি চড়তে ভালবাসে এবং শোনা যায় মদ্যপানও করে থাকে'। (১৮১৩-৩৫, পঞ্চদশ অধ্যায়)

১৮১৩ সালে একটি আইনে বলা হয় কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যগত হিসাব থেকে আঞ্চলিক হিসাব পৃথক করতে হবে। অর্থাৎ আঞ্চলিক হিসাবে থাকবে রাজস্ব প্রয়োগের জন্য। সামরিক ব্যয়, অসামরিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এবং ভারতীয় ঋণবাবদ সুদ পরিশোধের কাজে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যগত মুনাফা ব্যবহার হবে হুণ্ডি পরিশোধ ও অন্যান্য চলতি ঋণের পরিশোধে, ডিভিডেন্ড প্রদানে, এবং ভারতীয় ঋণ হ্রাসের কাজে; এই আঞ্চলিক রাজস্ব ব্যয়ের নামে মোটা টাকা হোমচার্জ বাবদ চলে যেত ইংলন্ডে। তাতেও ঘাটতি হতো বলে আঞ্চলিক হিসাব বেড়ে যেতে থাকে। যুদ্ধ চালাবার হিসাবের খাতে আরও অনেক ঋণের দরকার হয়ে পড়ে। হোম বণ্ড শোধ করার নামে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যিক মুনাফা চলে যেত

ইংলণ্ডে। সাম্রাজ্য বিস্তার আর কোম্পানির পতনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যিক মুনাফা হ্রাস পেতে থাকে। কোম্পানি সামরিক সামগ্রী ছাড়া ভারতের জন্য ইংলণ্ড থেকে অন্য দ্রব্য রপ্তানি বন্ধ করল। ভারত থেকে ইংলণ্ডে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মারফত আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই এমনটি ঘটল। ইংলণ্ডে ভারতীয় দ্রব্যের উপর মারাত্মক হারে শুল্ক বসানো হয়। অন্যদিক বৃটিশ শিল্পপতিদের শ্রমশিল্পজাত পণ্য ভারতের বাজার ছেয়ে গেল। বৃটেন থেকেই শুরু হলো ভারতে আমদানি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী মারফত। এলো সুতো, পশমী দ্রব্য, তামা, সীসা, লৌহ, কাঁচ ও মৃৎ পাত্র। 'ব্রিটিশ পণ্য কলকাতায় আমদানি হত সামান্য ২.৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে, আর ইংল্যাণ্ড ভারতের পণ্যের আমদানির উপরে চাপিয়ে দেয় ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক। শুরু হলো আমদানি আর আমদানি। রপ্তানি হতো খাদ্যশস্য। ইংলণ্ডের শিল্প সংরক্ষণ করে, ভারতর শিল্প চূর্ণ করে, বৃটিশ ব্যবসায়ীরা পরবর্তী কালে ভোল বদল করেন অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করে। তখন ভারতীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। (১৮১৩-৩৫, যোড়শ অধ্যায়)

বৃটিশপূর্ব যুগ থেকেই ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে আপত্তিকর শুল্কচাপ ছিল। ইংরেজ কোম্পানি এর হাত থেকে অব্যাহতি পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও এর সুযোগ অবৈধভাবে গ্রহণ করে। মীরকাশিম এই শুল্ক-ব্যবস্থা দেশী বিদেশী সব ব্যবসায়ীদের উপর থেকেই তুলে দেন। এ উদারতার মুল্য দিতে হল তার সিংহাসনের বিনিময়ে। ১৭৬৫ সালে দেশের রাজত্বপ্রতু হয়ে বসে ইংরেজ কোম্পানি। মীরকাশিমকে অনুসরণ করা তো দুরের কথা, রাজস্বের যে কোন ছিটেফোঁটার প্রতিও ছিল তাদের লোভ। ফলে মালচলাচলের উপরে চেপে বসলো দুর্বহ শুল্ক ও তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক হয়রানি। এই অনিষ্টকর ব্যবস্থা অব্যাহত ভাবে বেড়ে চলে ৬০ বছর ধরে। ১৮২৫ সালে হোল্ট ম্যাকেঞ্জি কঠোর ভাষায় এই ব্যবস্থার নিন্দা করেন। তিনি আভ্যন্তরিক শুল্ক তুলে দিয়ে, পশ্চিমাঞ্চলের আমদানিকৃত লবণের উপরে শুল্ক বসিয়ে ও সমুদ্রপথে মালচলাচলের উপর শুল্ক বসিয়ে লোকসান পুরণের সুপারিশ করেন। যেহেতু অন্তঃশুল্ক রদ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিস্তারের সহায়ক এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানগত ও তত্বাবধানগত ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থাবাহী, সেজন্যে আখেরে ভালো হবে বলেই তিনি মত দিয়েছিলেন। হোল্ট ম্যাকেঞ্জির কথায় কোম্পানি অবশ্য কর্ণপাত করেন নি। ইংরেজ কোম্পানি 'মুখে ভারতের জনগণের বৈষয়িক সুখসমুদ্ধির জন্য পরম উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, সেই সুখসমৃদ্ধির জন্য তাঁরা এক শিলিংও বিসর্জন দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন'।

১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতে আসেন গভর্ণর জেনারেল হয়ে। তিনি স্যার চার্লস ট্রেভলিয়নকে মালচলাচলের শুল্ক সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করতে বলেন। ট্রেভলিয়ন এই নিপীড়নমূলক শুল্কব্যবস্থা তুলে দেবার পক্ষে মত দেন। ১৮৩৫ সালে ইংলণ্ডে লর্ড এলেনবারো এই রিপোর্ট উদ্ধৃত করে অন্তঃ-শুল্কের খারাপ দিকগুলি তুলে ধরেন কোম্পানির সামনে। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। ১৮৩৬ সালে সমস্ত কাস্টমস হাউস ও নগর শুল্ক তুলে দেন লর্ড বেন্টিঙ্কের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড। এ ব্যবস্থা অবশ্য কোম্পানির ডিরেক্টরদের মনঃপুত হয়নি। ধারে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তঃশুল্ক উঠে যেতে থাকে।

সারা ভারতে একই মানের মুদ্রা চালু ছিল না। রৌপ্যমুদ্রা চালু করার প্রস্তাব হয়।

আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাব দাঁড়ি-মাঝিদের বেকার করে দেয়। পশুতে টানা গাড়ির রেলপথ বসালে দেশের টাকা দেশেই থাকতো অনেকখানি। খালপথ ভারতীয় কৃষির উপকার করতে পারতো, কিন্ত তাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে, ভারতের রাজস্ব থেকে সুদের একটা নির্দিষ্ট হারের নিশ্চিতি দিয়ে বাষ্পীয় যানের জন্য রেলপথের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (১৮১৩-৩৫, সপ্তদশ অধ্যায়)

এদেশে প্রশাসনিক কাজে অনেক গাফিলতি ধরা পড়ছিল। এই দেশের ভাষা ইয়োরোপীয় বিচারপতিরা কমই বুঝতেন। ভারতীয় পরামর্শদাতাদের দুর্নীতির ফলে বিচার প্রায় নিলামের পর্যায়ে পৌঁছায়। অর্থাৎ যে টাকা ফেলতো, মামলার রায় তার পক্ষেই যেতো। আর ছিল মামলার নামে নানা হয়রানি। আসলে দরকার ছিল দেশী যোগ্য লোকদের যোগ্য বেতনের মারফত প্রশাসনে যোগ্য স্থান দেওয়া। স্যার হেনরি স্ট্রাচি হিন্দু-মুসলমান স্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত বিচারশালার সুপারিশ করেন। তাঁর হিসাবে বঙ্গদেশে বিচারকের জন্য ভারতীয়দের নিযুক্ত করলে ব্যয়িত হবে ইয়োরোপীয় বিচারকদের তুলনায় মাত্র দশভাগের এক ভাগ। ইতিপূর্বে ইয়োরোপীয়রা ভারতীয়দের উপরে জঘন্য আচরণমাত্র করলেও যোগ্য দণ্ড লাভ করতো না। কালেক্টরদের কাছে বিচারের ব্যাপারটা ততো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যতটা ছিল রাজস্ব আদায়। ১৭৯৩ সালের পর থেকে কালেক্টর, বিচারপতি ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হয়। জমিদারী বাবস্থায় অত্যাচারিত কৃষকের কথা যেমন হেনরি স্ট্রাচি বলেছেন, তেমনি তিনি রায়তোয়ারি প্রথায় মাদ্রাজে কৃষকের উপরে অত্যাচারের ঘটনাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাদ্রাজ সরকার কালেক্টরের রাজস্ব আদায়কে প্রশাসনিক অন্যান্য কাজের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দেবার ফলেই আসে এই বিপত্তি। রায়তোয়ারি ব্যবস্থায় কালেক্টররা যে আসলে এস্টেটের ম্যানেজার মাত্র- বিচারের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা যে পীড়নমূলক হতে বাধ্য, এটা স্যার হেনরির নজর এড়িয়ে যায়নি। তিনি বরং তদারকের কাজের জন্যও ভারতীয়দের নিয়োগই সুপারিশ কবেছিলেন। টমাস মুনরোও ভারতে ন্যায়বিচারের জন্য এ-দেশীয় যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যকাজে ইয়োরোপীয়দের সমকক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। পঞ্চায়েতী বিচারের তিনি অনুরাগী ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বৃটিশ প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার ফলে মামলার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। বোম্বাই-এর কর্ণেল ওয়াকার বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণতার পক্ষে যুক্তি দেখালেও ভারতীয় বিচারকের হাতেই বিচারবিভাগ ছেড়ে দেবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কোনো পদানত দেশকে যোগ্য ভাবে পরাধীন রাখতে গেলেও ঐদেশী লোকজনের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন। ভারতীয় কার্যকুশলতা সম্পর্কে ইংরেজদের বিরূপ মনোভাবের জন্য দায়ী যে ইংরেজদের নিজেদের স্বার্থভাবনা, তা চমৎকার ভাবে ওয়াকার দেখিয়ে দেন। (১৮১৫-৩৫, অষ্টাদশ অধ্যায়)

সার হেনরি স্ট্রাচি, কর্ণেল মুনরো এবং কর্ণেল ওয়াকারের মন্তব্য ইত্যাদি থেকে, ১৮১২ সালে সিলেক্ট কমিটি প্রদত্ত পঞ্চম রিপোর্ট এবং পরিশেষে মুনরো ও ম্যালকমের হাউস অব কমন্সের সম্মুখে সাক্ষ্যদান ইত্যাদি ইংলণ্ডের জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা নেয়। তার ফলে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর কর্ণেল মুনরোর সভাপতিত্বে ভারতে প্রশাসনিক উন্নতির জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করেন। মাদ্রাজ পৌঁছে দ্রুত

কাজ করে তিনি কয়েকটি সুপারিশ করেন : (১) কালেক্টরের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকবে, গ্রামীণ শান্তিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে গ্রামের প্রধানদের উপরে; (২) গ্রামীণ পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে; (৩) এ দেশী জেলা জজ অথবা কমিশনারদের নিযুক্ত করতে হবে; (৪) কালেক্টরের হাতে পাট্টাদানের সুযোগ থাকবে; (৫) জমিদারদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হবে; (৬) সীমানা বিরোধ কালেক্টররাই মিটিয়ে দেবেন।

মুনরো মূলত দুটি ঝোঁক দেখিয়েছিলেন। প্রথমত, ভারতীয়দের যথাসম্ভব বিচার-বিভাগে দায়িত্বশীল পদের অধিকারী করা এবং দ্বিতীয়ত তিনি সমস্ত রাজস্বমূলক, শাসনমূলক এবং শান্তিরক্ষামূলক কাজকর্ম, জেলার কালেক্টরের উপরে ন্যস্ত করেন। তার এই দ্বিতীয় ঝোঁক হয়তো এ যুগের বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ছিল, কিন্তু কার্যগতিকে তা অপ্রয়োজনীয় ও নিপীড়নমূলক হয়ে ওঠে। মুনরোর গ্রাম-পুলিশের সুপারিশ শেষ পর্যন্ত আর গ্রহণ করা হয়নি। বরং দেশে একটি আলাদা পুলিশ বিভাগ গড়ে ওঠে। গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনও ব্যর্থ হয়। মুনরোর ক্ষমতাকেন্দ্রিকরণ নীতি রাজস্ব কর্মচারীদের পীড়নমূলক যন্ত্রে পর্যবসিত করে। বঙ্গদেশ ও মাদ্রাজ দখলের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ইংরেজদের বোম্বাই অঞ্চল করতলগত হয়। ১৮১৭ সালে শেষ পেশোয়া ইংরেজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন, এবং তার রাজ্য বৃটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বোম্বাইতে বৃটিশ প্রশাসন গড়ে তোলার দায়িত্ব পড়ে মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের উপর।

মারাঠাদের সম্পর্কে কার্যব্যপদেশে এলফিনস্টোনের নানা অভিজ্ঞতা হয়। ১৮১৮ সালে তিনি দক্ষিণাপথের কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮১৯ সালে তিনি বোম্বাইয়ের গভর্ণর হন এবং আট বছর ব্যাপী তার গভর্ণরের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমভারতেও তিনি বৃটিশ শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। এলফিনস্টোনের উদার শাসনের সাফল্যের ছিল তিনটি চাবিকাঠি, (ক) আইন-কানুন গ্রন্থভূক্তিকরণ, (খ) প্রশাসনমূলক কাজকর্মে ব্যাপকভাবে ভারতীয়দের নিয়োগ, এবং (গ) শিক্ষাবিস্তার। এলফিনস্টোন জেরেমি বেন্থামের অনুরাগী ছিলেন। ভারতীয় ইতিহাস ধারার স্বকীয় প্রভাব নয়, বরং ক্রমশই ভারত ইতিহাসে ইয়োরোপীয় ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছিল।

ভারতে স্ব-শাসনের অনুপস্থিতি ভারতকে ইংলণ্ডের উপরে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল করে তুলেছিল। অবশ্য মুনরো, এলফিনস্টোন ও বেন্টিঙ্কের প্রশাসনে এদেশী জনগণ অনেকখানি দ্বায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। এলফিনস্টোনের উচ্চশিক্ষার প্রসারমূলক কাজকর্ম কোর্ট অব ডিরেক্টরস পছন্দ করেননি। এ-দেশী প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনেরও তারা বিরোধিতা করেন। নিম্নশ্রেণী জনগণের জন্যও এলফিনস্টোন শিক্ষা বিস্তার চান। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-শিক্ষা তার পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তি ছিল। ভারতীয় ভাষায় স্বাস্থ্য ও নীতিশিক্ষার গ্রন্থপ্রকাশ এবং ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে তিনি উদ্যোগী ছিলেন। ১৮২৭ সালে মুনরোর মুত্যু হয়। এলফিনস্টোনও ঐ বছর ভারত ত্যাগ করেন। তবে লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক ঐ বছর গভর্ণর জেনারেল হয়ে কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রশাসন ও নানা ধরনের রাজকার্যে পূর্ব থেকেই লর্ড বেন্টিঙ্কের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল।

প্রশাসন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক মুনরো ও এলফিনস্টোনের পথাবলম্বী ছিলেন।

তিনি বিচার বিভাগে সদর-আমিন নামে ভারতীয়দের জন্য পদসৃষ্টি করেন। ডেপুটি কালেক্টর নামেও ভারতীয়দের জন্য পদসৃষ্টি হয়। উত্তর ভারতে খাজনার তিন-চতুর্থাংশ ছিল ভূমি-রাজস্ব। তিনি তা হ্রাস করে দুই-তৃতীয়াংশ করেন। ১৮৩৩ সালে আর এস বার্ডের কর্তৃত্বাধীনে উত্তর ভারতে নতুন ভূমি-বন্দোবস্ত চালু করা হয়। রাজা রামমোহন রায় বেটিঙ্কের সমর্থন লাভ করেন সতীদাহ প্রথা রদ করার কাজে। স্লীম্যান তার আমলেই ঠগীদের দমন করেন।

১৮৩৩ সালে কোম্পানির সনদ নবীকরণের সময়, বাণিজ্য করার কাজ থেকে কোম্পানিকে দায়মুক্ত করা হল। এরপর থেকে তারা কেবলমাত্র এ-দেশ শাসনের দায়বদ্ধ হয়ে রইলেন। গভর্ণর জেনারেলের আইন উপদেষ্টা পদ সৃষ্টি হল। নিযুক্ত হলেন মেকলে। তিনি পেনাল কোড-এর প্রথম খসড়া রচনা করেন। মেটকাফ বেন্টিঙ্কের প্রশাসনধারা অনুসরণ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেন। ট্রেভলিয়ন অন্তঃশুল্ক রদের ব্যবস্থা করেন। ঘাটতি থেকে সরকারী আয়-ব্যয় বেন্টিঙ্ক উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত করেন। মেকলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেন। বেন্টিঙ্ক ২০শে মার্চ ১৮৩৫ ভারত ত্যাগ করেন। তার স্বদেশবাসীদের মধ্যে তীব্র নিন্দুকের অভাব ছিল না। বেন্টিঙ্ক নিজ কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে ভারতে ভারতীয়দেরই প্রশাসনে অধিকতর দায়িত্ব দিয়ে দেশশাসনে ভারতবাসীর ভূমিকাকে কার্যকর করার চেষ্টা করেছিলেন। (১৮১৫-৩৫, উনবিংশ অধ্যায়)

টমাস মুনরোর থেকে প্রায় বিশ বছর বয়ঃকনিষ্ঠ এলফিনস্টোনের রাজস্ব সংক্রান্ত কাজের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জনদরদী মন, সাহিত্যরুচি ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধিকল্পে উদার রাষ্ট্রনীতিসুলভ ঈপ্সা। পেশোয়ার নিকট থেকে অধিকৃত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে তার প্রতিবেদনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিবেদনে তিনি ঐ অঞ্চলের গ্রাম-সমাজের বিশিষ্টতার উপরে যথেষ্ট আলোকপাত করেন। বিভিন্ন গ্রাম বা উপনগরীতে বিভক্ত দাক্ষিণাত্যের গ্রাম-সমাজগুলিতে রাষ্ট্রের সবগুলি উপাদানই বিরাজিত ছিল। যে-কোন নিকৃষ্ট সরকারের ত্রুটিগুলির ক্ষেত্রে সেগুলি ছিল যেন প্রতিকার-স্বরূপ। গ্রামসমাজের আয়ত্ত্বাধীন সীমানা-চিহ্নিত গ্রামগুলির সংলগ্ন যে জমি ছিল, তাও সীমানাবিভক্ত হয়ে অনেকগুলি ক্ষেতে বিভক্ত হতো। চাষীরা ঐ জমি চাষ করতো। গ্রামে ছিল ব্যবসায়ী ও কারিগর- যারা ঐ চাষীদের চাহিদার যোগান দিত। গ্রামের প্রধানের নাম ছিল পাতিল, পাতিলের অধীনে থাকতো চৌগুল্লা ও কুলকার্নি। তাছাড়া ছিল নানা পেশার বারো বলেতি এবং চৌকিদার। পাতিলই হলেন গ্রামের প্রধান। তিনি প্রশাসন, শান্তিরক্ষা ও বিচারের জন্য ছিলেন ভারপ্রাপ্ত। তাছাড়া তিনি রাজস্ব সংগ্রাহক। তিনি সরকার এবং রায়ত - উভয়েরই প্রতিনিধিবিশেষ। রায়তদের বেশ বড় অংশই ছিল পুরুষানুক্রমে জমির মালিক। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব যেমন ছিল তেমন তা ছিল বিক্রয়যোগ্য। জমির মালিক মিরাসদাররা নানা ধরনের খাজনার চাপে দরিদ্র হযে পড়ায় নতুন 'উপরি' প্রথার উদ্ভব ঘটে। এলফিনস্টোন রাজস্ব ইজারা ব্যবস্থার পক্ষাবলম্বী ছিলেন না, তিনি প্রকৃত চাষের উপরে ভিত্তি করে রাজস্ব ধার্যের পক্ষপাতী ছিলেন।

জেলাগুলি মামলাতদারের অধীনে রাখা হতো। বৃটিশ শাসনের ফলে আগেকার অভিজাত ও উচ্চবর্গের মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হলেও এলফিনস্টোন তাদের অবস্থা সুরক্ষার চেষ্টা করেন। মামলাতদার ব্যবস্থা পরিচালিত হলেও তিনি পাতিলদের গণক্ষমতা চূর্ণ করতে

চাননি। এলফিনস্টোন ধর্মীয় শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজের দোষগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন। মারাঠা রাজ্য-শাসন ব্যবস্থায় যে ত্রুটিগুলি ছিল পঞ্চায়েতী স্ব-শাসনে তার অনেকখানিই বিদূরিত হতো। পঞ্চায়েতী বিচার-ব্যবস্থার সুপারিশ করে এলফিনস্টোন বলেছিলেন যে, এব্যবস্থা ব্যর্থ হলে আদালত-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেই চলবে। অবশ্য এলফিনস্টেনের পরবর্তী শাসকদের দূরদৃষ্টিহীনতার ফলে পঞ্চায়েতী শাসন বা গ্রামসমাজের শাসন অন্তর্হিত হয়ে যায়।

এলফিনস্টোনের আট বছরের শাসনে ব্রোচ, আহমেদাবাদ, সুরাট, কোঙ্কণ, দাক্ষিণাত্য, খান্দেশ, পুণা, আহমেদনগর, ধারওয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে নানা ধরনের ভূমি-বন্দোবস্ত চালু হয়। ব্রোচ অঞ্চলে সাধারণ নীতি ছিল গ্রাম ধরে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ। ফসল বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়া যেত তার অর্ধেক নিয়ে বাকিটা রায়তের হাতে ছেড়ে দেওয়াটাই ছিল নীতি। আহমেদাবাদে গ্রাম ইজারা দেওয়া হতো। সুরাটে ভূমি-রাজস্ব অত্যন্ত গুরুভার হয়। কোঙ্কণে এলফিনস্টোনের ইচ্ছা ছিল "সরকারের দাবী মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশে নির্দিষ্ট করা হোক, এবং নিকৃষ্ট ধরনের জমিতে তা নির্দিষ্ট করা হোক কম আনুপাতিক হারে। নির্ধারণের হার চিরস্থায়ী না করে বারো বছরের জন্য বন্দোবস্ত করা হোক। দক্ষিণ কোঙ্কণে ছিল কুলারগি (খাজনা স্থিরীকৃত) এবং খোটেগি (গ্রামপ্রধান কর্তৃক খাজনার হার পরিবর্তনসাপেক্ষ) গ্রাম। দু-রকম প্রথা ছিল। ধারেকরী ও আরধেলি। ধারেকরী-প্রজা জমি বন্ধক রাখতে পারতো, খাজনা নিয়মিত দিলে তাকে উচ্ছেদ করা যেত না। আরধেলি-রায়ত তেমন নয়। সে জমি বন্ধক-কবালা করতে পারতো না। সে চষে অন্য মালিকের জমি। এ জমিতে বার্ষিক দায় দেখা যায়। পুণা, আহমেদনগর, খান্দেশ, ধারওয়ার, সাতারা ও দক্ষিণাঞ্চলের জায়গীরগুলিতে মোটামুটি এক ধরনের রায়তোয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

এস্থানগুলিতে মিরাসী ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। অনেকেই ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক মিরাসীব্যবস্থায় অস্তিত্বকে মানতে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কার্যত সে অধিকার হরণ করা হয়। এলফিনস্টোন গ্রাম-ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করে রায়তোয়ারি ব্যবস্থা সহনীয় করে তোলার ব্যাপারে অধিক মনস্ক ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি আলাদা রায়তের সঙ্গে ভূমি-বন্দোবস্ত করণে, পাতিলের আর বিশেষ কোনও ভূমিকা থাকে না। মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ এই দুর্বল অংশটির সুযোগ নিয়ে গ্রাম ব্যবস্থার বিলোপসাধন করে দেন (১৮১৭-২৭, বিংশ অধ্যায়)।

রমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক তরুণ সান্যালের সংক্ষিপ্তসার)

তবে এতক্ষণ আমি যে বিবরণ পেশ করলাম, সেই বর্ণনা যেমন এই দেশের সৌন্দর্য এবং উর্বরতা বয়ান করে তেমনি বাসিন্দাদের দারিদ্র্য বিষয়ে আমার প্রস্তাবের সত্যতাও প্রতিপাদন করে। এই বইতে প্রকাশিত নানান বিবরণ দিয়ে নিশ্চিত করা তথ্য, চরম জঘন্যতার প্রকাশক, এই ধরণের জঘন্যতা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে খুব বেশি দেখা যায় না; এবং এই ধরণের জঘন্যতার ধারাবাহিকতা ব্রিটিশ নামে শাসক দেশের জন্যে গভীর অমার্জনীয় অসম্মানের পরিবেশ তৈরি করেছে।

এই সরকারী প্রতিবেদন [বুকানন হ্যামিলটনের করা ৪ দশক আগের সমীক্ষা] স্বাভাবিকভাবে সরকারকে জমা দেওয়া হয়; কিন্তু সরকারের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে? আমরা যে বর্বরতা এবং স্বার্থপরতা জনগণের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছি, সেই ভুক্তভোগী জনগণের উপকারের জন্য ইংল্যান্ড বা ভারতবর্ষের সরকারের পক্ষ থেকে কি কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? নাহ, নেওয়া হয়নি! পক্ষান্তরে, ব্রিটিশ বাণিজ্যের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার যাঁতাকলে হতভাগ্য মানুষদের আরও দরিদ্র করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। পাঠকের সামনে উল্লিখিত তথ্যে সমীক্ষা চালানো জেলাগুলিতে বস্ত্রবয়নের ওপর নির্ভরশীল চরম দক্ষতা সম্পন্ন কারিগরদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

মুক্ত বাণিজ্যের সনদ সত্ত্বেও ইংলন্ড, ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার, গ্লাসগো ইত্যাদি শহরের বাষ্পচালিত তাঁতের পণ্যে নগণ্য আমদানি শুল্ক প্রয়োগ করে ভারতবর্ষের বাজারে বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং হিন্দুদের সে সব বস্ত্র কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। যদিও বাংলা আর বিহারের শৈল্পিকভাবে দেখতে অসামান্য সুন্দর এবং পরিধেয় হিসেবে টেকসই হাতে তৈরি বস্ত্র ইংলন্ডের বাজারে আমদানি করতে বহুকাল ধরে কঠোরতম এবং চরম নিষেজ্ঞামূলক শুল্ক আরোপ করা হয়ে চলেছে; আমাদের বার্মিংহাম, স্টাফোর্ডশায়ারের গৃহস্থালী সামগ্রী প্রাচ্যের কারিগরদের জীবন জীবিকা ধ্বংস করছে; ভারতবর্ষের এই ধরণের কারিগর ইংল্যান্ডে সঞ্চিত পুঁজি (একিউমুলেটেড ওয়েলথ) এবং বাষ্প-শক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না।

অথচ একের পর এক মন্বন্তর আর মহামারির ধাক্কায় বেসামাল হিন্দুদের দেশ থেকে চিনি, কফি, রাম, তামাক ইত্যাদি আমদানি নিষিদ্ধ করে আমরা সেই দেশের মানুষদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আমরা ভারতবর্ষের জনগণের সুবিধার্থে কোনও জন পরিকাঠামো গড়ে তুলিনি; অথচ ভারতবর্ষের ২ লক্ষ সেনার ভরণপোষণ এবং অসম্ভব খরুচে সরকারি কাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বছরে বাধ্যতামূলক ২০ লক্ষ পাউন্ড বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হয়, এবং সে আদায়ের নিশ্চয়তার কাছে অন্য সব পরিকল্পনা তুচ্ছ হয়ে যায়। অর্ধশতাব্দ ধরে আমরা ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্য জুয়ার ঘাটতি (কমার্শিয়াল স্পেকুলেশন) মেটাবার জন্যে কখনও ২০, কখনও ৩০ আবার কখনও কখনও ৪০ লক্ষ পাউন্ড

লুঠ করে গ্রেট ব্রিটেনে পাঠিয়েছি। যে সঞ্চিত অর্থে হিন্দুস্তানের মানুষদের জীবন অতিবাহিত হওয়ার কথা, সেই অর্থ খরচ করা হচ্ছে ঋণের সুদ মেটাতে, হোম এস্টাব্লিশমেন্টের খরচ তুলতে এবং ইংলন্ডের ভূমিতে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করতে।

আমরা জানি না, ভারতের মতো একটা দূরবর্তী দেশ থেকে বছরে যে ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ পাউন্ড ক্রমাগত লুঠ হচ্ছে এবং যে লুঠ করা অর্থের একটাও পেনি ভারতবর্ষে কোনও আকারে, ফিরে আসে না - সেই লুঠের চরমতম কুপ্রভাব সম্পূর্ণ এড়ানো মানুষের বুদ্ধিমত্তার পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা। এই ধরনের ড্রেনের/লুঠের ধ্বংসাত্মক প্রভাব প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলা হয়েছে এবং সেই তথ্যের নির্ভুলতাকে আজও অস্বীকার করা যায়নি। এই বেদনাদায়ক বিষয় বিবেচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন উঠে আসে, আমরা ভারতবর্ষকে যে অসীম যন্ত্রণা দিয়ে চলেছি, সে যন্ত্রণা দূর করার জন্য আমাদের কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। জনগণ সমস্ত উদ্যম, অভূতপূর্ব দক্ষতা সত্ত্বেও দৈনিক ১ ডলার, দেড় ডলার বা ২ ডলারের বেশি রোজগার করতে পারছে না, অথচ তাকে তার তাঁত চালাতে বা তার লোহার কারখানা চালাতে বা চাষ করতে বছরে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ সুদে পুঁজি ধার করতে হয়। ফারো টেবিলের খেলায় খেলোয়াড় যতই সফল হোক না কেন, বিপক্ষের বিরুদ্ধে তার জেতার সম্ভাবনা যাই হোক না কেন, তার পুঁজির পরিমাণ যাই হোক না কেন, প্রতিপক্ষের চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত করতে তার একটাই অপশন নিরন্তর খেলা না থামিয়ে চালিয়ে যাওয়া। একইভাবে বেচারা হিন্দু চাষী বা কারিগরের তিনটে মরশুমের মধ্যে দুটো মরশুম তাকে উদ্বৃত্ত অর্থ দিলেও তাকে বাজার থেকে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ সুদে টাকা ধার করতেই হবে কারণ গত দুটো মরশুমে তার খারাপ চাষ হয়েছে, ফলে তার সঞ্চয় প্রায় নেই বললেই চলে (এরকমও প্রচুর মানুষ আছেন যারা শুধুই রোজকার রোজগারে বেঁচে থাকেন); চড়া সুদ তাকে আরও গরীব বানাচ্ছে। এই ধরনের সামাজিক অবস্থা জনগণের যে সমৃদ্ধি আনতে পারে না, বরং এই পরিবেশ মানুষের ধ্বংস হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা - এই বিষয় বুঝতে আন্তঃসম্পর্কের গভীর জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই। জনগণের ওপর নিশ্চিত দুর্দশার চাপিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা বাণিজ্যিক অবিচারও এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি, অর্থাৎ হিন্দুদের তৈরি প্রিয় কারিগরির ওপর ইউনাইটেড কিংডমের বাজার বিপুল কর চাপানোর দরুণ ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষে তাদের পণ্য যত শস্তায় বিক্রি করার যে বিপুল সুবিধে পায়, সে সুবিধে ভারতবর্ষীয় কারিগরদের পণ্য ব্রিটেনের বাজারে পায় না; ভারতবর্ষের এই যে দুর্দশা আমরা দেখছি, ভারতবর্ষ এই যে বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে, তার জন্য কি আমাদের আদৌ অবাক হওয়া উচিৎ?

আমাদের স্বীকার করতেই হবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে প্রতি বছর ৩০ লক্ষ পাউন্ডের অব্যাহত ড্রেন/লুঠ এড়ানো অসম্ভব surely it is our duty, a sacred and imperious duty, to mitigate the effects consequent on this unceasing exhaustion of the capital of the country. ভারত সরকার জনগণকে সামান্যতম স্বস্তি না দিয়ে এই লুঠ চালিয়ে যাচ্ছে এবং, দিনের পর দিন এই লুঠ চরম আকার ধারণ করেছে। আমরা একটা মাত্র প্রদেশের (বাংলা) চিনির ওপর ১৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে তাকে বাজারে বিক্রি করার সুযোগ করে দিয়েছি, কিন্তু ভারতবর্ষের রাম, তামাক বা এ ধরনের পণ্যকে প্রায়

নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি ইংলন্ডের বাজারে। আমরা বিলাসবহুল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছি (যার জন্যে এক পেনিও খরচ করতে হয় না), অথচ বাণিজ্যের অধিকার বিষয়ে আমরা ভারতের সঙ্গে এমন স্বৈরাচার চালাচ্ছি যার তুল্য উদাহরণ প্রাচীন বা বর্তমান আধুনিক যুগের ইতিহাসে মেলা ভার। আমরা ভারতবর্ষের ওপর অবিচারের বৃশ্চিক দংশন বারবার চাপিয়ে দিচ্ছি, ভারতের প্রতি নিষ্ঠুর ও উদার আচরণের দ্বারা ইংল্যান্ড যেসব সাময়িক এবং তুচ্ছ সুবিধা লাভ করে, সেই অবিচার যদি নিরন্তর চলতে থাকে তাহলে জনগণের ওপরে এর দশ গুণ প্রভাব পড়তে বাধ্য।

শান্তি, সমস্ত আশীর্বাদের অগ্রদূত; দৈব দূরদর্শিতায় ইংল্যান্ড হিন্দুস্তানে শান্তি পুনরুদ্ধারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং, এখনও পর্যন্ত সে দেশে শান্তি বিদ্যমান। আটলান্টিকের একটি ক্ষুদ্র দেশ যে অতুলনীয় ক্ষমতা এবং সম্পদের বলে ভারতবর্ষের মত বিশাল সাম্রাজ্য দখল করতে সমর্থ হয়েছে তাকে আমরা একমাত্র ইতিহাসের দেওয়াল লিখন বলে অভিহিত করতে পারি - কিন্তু যদি ভারতবর্ষে এই ধরণের লুঠেরা কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে কখনও একটি জাতির ভাগ্যে বিলয় হয়ে যাওয়ার মত শাস্তি বরাদ্দ হয়, সে দেশের নাম হোক ইংলন্ড। এই দ্বীপের বুদ্ধিমান এবং মন দিয়ে খ্রিস্ট ভাবধারায় নিষিক্ত হয়ে থাকা অংশকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে; তারা দীর্ঘকাল পশ্চিমে বহুকাল নিগ্রো জনগণের জন্যে মানবহিতৈষণা প্রদর্শন করেছে, এখন এই মানবহিতৈষণাকে সেই দুর্দশার উপশমের দিকে পরিচালিত করা হোক যে দুষ্কর্ম প্রাচ্যে তাদের একশ মিলিয়ন প্রজাকে হতাশ ও অবদমিত করে রেখেছে।

তাদের কর্ম সম্পাদন করার জন্যে মাঠ প্রস্তুত। বাংলা, মাদ্রাজ আর বম্বে প্রেসিডেন্সির ১০ কোটি মানুষের পাশাপাশি আরও ১০ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশিয় রাজ্য এবং প্রশাসনিক এলাকায় জুড়ে আছেন। আমাদের হাতে এমন এক ভূমি আছে যা মানব সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে যুক্ত, যে ভূমিতে বয়ে চলে দুধ আর মধুর নদী, বিশাল বিশাল পাহাড়ের সমাবেশ, বিশাল বিশাল নদী, এবং উর্বরতম সমভূমি। জনগণ উৎসাহী, বুদ্ধিমান, সাহসী, আমাদের বলের সামনে নয়, নৈতিকতার সামনে অবনমিত হয়েছে, অতীত ভুলে গিয়ে তারা খ্রিস্টধর্মী ব্রিটেনের স্বনামধন্য অখণ্ডতা, নৈতিকতা এবং গর্বিত সাম্য প্রদায়ী ক্ষমতার প্রতি আস্থা রাখতে রাখুক। তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিগ্রোদের জন্যে যে মহানুভবতা প্রদর্শন করেছে তার এক দশমাংশ ব্যয় করুক আমাদের এংলো-ইন্ডিয়ান সাম্রাজ্যের অবহেলিত প্রজাদের প্রতি ন্যায় প্রদর্শনে।

প্রথমে হিন্দুদের ধর্ম আর কুসংস্কারে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই - বা শিক্ষাতেও (সে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন) হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তাত্ত্বিকভাবে হিন্দুদের ধর্ম যতই অরুচিকর হোক না কেন, হিন্দুস্তানের প্রতি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা যে আচরণ করছে, বাস্তবে তার চেয়ে বেশি অন্যায়ের হতে পারে না; আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন ন্যায়বিচারই আমাদের ধর্মের একমাত্র ভিত্তি, তাহলেই হিন্দুদের কুসংস্কার এবং কুপ্রথাগুলি ধীরে ধীরে এবং কার্যকরভাবে সত্যের আলোর সামনে উপস্থিত হবে। খ্রিস্টধর্মকে হিন্দুদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই উপহাসাস্পদতা, মূর্খতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা; যতক্ষণ আমাদের নীতিতে, আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা এবং নিষ্ঠুরতার

ছাপ থাকবে, সেই নীতি, সেই স্বার্থপরতা কোনো মূর্তিপূজক বা বিধর্মী জাতি অতিক্রম করতে পারবে না।

হিন্দুস্তানের কল্যাণের জন্য গৃহীত প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি হল, প্রথমত ভারত জুড়ে ভূমি রাজস্ব একটি নির্দিষ্ট মাঝারি পুনরুদ্ধারযোগ্য হারে নির্ধারণ করা হোক, যাতে চাষীরা প্রতি বছর শোষিত না হয়, যেভাবে সারাদিন ধরে মৌমাছিদের সংগ্রহ করা মধু রাতে লুঠ করা হয়। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের যে কোনও পণ্য ব্রিটিশ বন্দরে পৌঁছলে সে সবের প্রতি যাতে সাধারণ সুবিচার করা হয়। ইংলন্ড, ভারতবর্ষীয় পণ্য যে শুল্ক প্রয়োগ করবে, একই পরিমাণ শুল্ক ভারতবর্ষের বাজারে আসা ব্রিটিশ পণ্যের ওপর প্রয়োগ করা হোক। এই ধরণের মুক্ত বাণিজ্যের অধিকার ফ্রান্সের কাছে চাওয়া হলেও ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। তৃতীয়ত গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলোয় শক্তিশালী নৈতিকতাপূর্ণ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করা হোক; যে কোনও মুক্ত দেশে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা জনগণ নিজের হাতে তুলে নেয়; ব্রিটিশ ভারতবর্ষ স্পষ্টতই একটি স্বৈরতন্ত্র-একটি অলিগার্কিকাল, বৈদেশিক স্বৈরাচারী শক্তি -এবং তাই তাকে প্রজার চাহিদা পূরণ করতে আরও বেশি বাধ্য করা উচিত। আমার প্রস্তাব হল, যে বিভিন্ন পাবলিক ট্রেজারি থেকে ৫০ থেকে ৫০০ সিক্কা টাকার বিভিন্ন পরিমাণের সরকারি নোট জারি করা হোক, মুদ্রার চাহিদা অনুযায়ী সেগুলি বিতরণ করা হোক এবং ট্যাক্স বা যে কোনো সরকারি বকেয়া পরিশোধের জন্য কোষাগারে আবার তাকে গ্রহণযোগ্য করা হোক। এটাই মুদ্রা চক্র পরিচালনার স্বাভাবিক মাধ্যম। একটি শক্তিশালী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা উচ্চ সুদের হার কমিয়ে দেবে; ঋণকে যথাযোগ্য স্তরে তুলে নিয়ে আসবে, দাম বৃদ্ধি করবে, শিল্পকে পুঁজি নিয়োগ করতে উৎসাহিত করবে - মজুতদারি কমাবে, সম্পদের নিরাপদ এবং বৈধ ব্যবহারে দিয়ে মজুদ ও কুসিদজীবিতা রোধ করবে, এবং ঋণের উপকারী প্রভাবের উদাহরণ প্রদর্শন করে জনগণের নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক দেশেই ব্যাঙ্কিং এমত প্রভাব ফেলেছে, এবং আমার এই বইয়ের তথ্য প্রমাণ করবে ভারতের মত কোনও দেশের মাটিই ব্যাঙ্কিং সফল হওয়ার মত উপযুক্ত নয়। প্রতিটি শহরে পৌর ব্যবস্থা স্থাপন করে শহর পরিষ্কার করা, আলো লাগানো এবং জীবনধারণের মান উন্নত করা দরকার; তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে মেলা আয়োজন আর বাজার স্থাপন করতে হবে। পাটনার সঙ্গে জুড়ে থাকা বিস্তারিত তথ্য থেকে একটা বিষয় প্রমাণ হয়, এই শহরে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাব আছে; তবে জনগণকে স্ব-শাসনের অভ্যাসে দীক্ষিত করে, তাদের পারস্পরিক কল্যাণের জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে একত্রিত করা দরকার - এইভাবে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত পথে জাতপাতের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি ধ্বংস করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে, আমি আশা করব যে ব্রিটিশ ভারতের গুরুতর, গম্ভীর, করাল দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দেরি হওয়ার আগেই ইংল্যান্ড এ বিষয় নিয়ে চর্চা করতে জেগে উঠবে; এই কাজ সম্পাদন করতে স্বর্গ তার উপর আস্থা রেখেছে, এই কাজে অবহেলা বা অপব্যবহারের শাস্তি ভয়ঙ্কর হবে। lt seems to be one of the results attendant on the sociality of man that national suffering and remote consequences, however terrible, have less effect on him than the misery of a single individual,

or proximate results however trifling; but surely this is not the doctrine or precept of Christianity ? বর্তমান প্রজন্ম হয়তো ভারতের প্রতি এখন যে অবিচার করা হচ্ছে তার জন্য ক্ষুব্ধ হবে না, এবং হয়ত আরও এক শতাব্দ সম্রাজ্য অখণ্ডতা রক্ষা করবে। but if we acknowledge that we owe many of the blessings of civilization to our ancestors, are we not bound by every sacred obligation to transmit them not only unimpaired but improved to our posterity. যে কোনো বুদ্ধিমান বিধর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের মতবাদকে স্বীকৃত এবং কার্যকর করতে একটি খ্রিস্টান জাতির বাস্তব নীতি কতটা উচ্চতর হওয়া উচিত? Lofty, proud, and glorious as. is this empire on which earth's sun never sets- He who gave to it a puissance unrecorded in the annals of mankind, did so in accordance with His wisdom for some good use—but unless that good use be derived and made evident to the world— the pride, the strength and glory of England will serve only to measure the height of her fall, and to add another fact to the chronology of those kin - doms which forgot the source whence they sprung and the purport for which they were created —then may the inspired language of Isaiah when' crying, listen O Isles unto me, and harken ye people from afar, be applied.

Oh that thou hadst hearkened to my commandments! then had thy peace been as a river, and thy righteonsness as the waves of the sea; thy seed also bad been as the sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof; thy name sbould not have been eat off nor destroyed from before me. Isaiah, XIviii

The History Antiquities Topography And Statistics Of Eastern India Vol. IV

মন্টগোমারি মার্টিন

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
অক্ষরযাত্রা প্রকাশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'পলাশীর প্রান্তরে আজ...' শীর্ষকে প্রকাশিত

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১-এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বই-এর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা - যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বাম-আন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকাকালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০টা হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্ক-একাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

জ্ঞানগঞ্জ

উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

ফারসিতে গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে গঞ্জ খেলা ছিল, আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম ছিল গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি জীবধারণের ভিত্তি, যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর; আমরা যারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন করি, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজে নিজে তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর হকার চাষীর এ এক অনন্ত শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে বুকে, মাথায় বাস করে। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চাই নি, চেয়েছি চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ আজকের বাস্তবতায়, আজকের আলোচনার টেবলে ফেলতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী কী করা উচিৎ নয় এবং কী করা উচিৎ সে আলোচনা আদিত্য নিগমের সঙ্গে এবং খুনি গণহত্যাকারী ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা; দেখেছি কিভাবে হোয়াটসেপের মাধ্যমে মিথ-মিথ্যের পাঠক্রম ছড়ায়; একই সঙ্গে দেখছি কিভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবিরা বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়ে কাজ করে; একই সঙ্গে আমরা বুঝচেয়েছি বাংলার নৌকোকে এবং উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি; চলতি সংখ্যায় লুঠেরা গণহত্যাকারী উপনিবেশের অনন্ত লুঠের বাখানকে ধরতে চেয়েছি।

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)'
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়_মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান